গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ২৭ মার্চ - ২ এপ্রিল, ২০০৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

গ্রামীণ মানুষরাই বলে গেলেন

সিপিএম সরকারের গ্রামোন্নয়নের প্রচার ডাহা মিথ্যা

জনগণের ট্যাক্সের বিপুল অর্থ খরচ করে টিভি-র বিজ্ঞাপনে হাস্যোজ্জ্বল কৃষক ও কৃষকরমণীর ছবি প্রচার করছে সিপিএম সরকার। স্লোগানে, দেওয়াল লিখনে, বক্তৃতায় নেতা-মন্ত্রীরা প্রচার করে চলেছেন, কৃষিতে আমরা প্রথম, এখন বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। যেন মজবুত কৃষির উপর ভিত্তি করে তাঁরা শিল্প গড়ে তুলতে চলেছেন। প্রচার করছেন, তাঁদের রাজত্বে গ্রামীণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা নাকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এ তাঁদের পঞ্চায়েতি রাজের সাফল্য, গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির সাফল্য।

এহেন প্রচারের ফোলানো বেলুন গত ৯ মার্চ ফুটো করে দিয়ে গেলেন গ্রামবাংলার হাজার হাজার কৃষক ও খেতমজুর, রাজধানী কলকাতার বুকে মহামিছিলের মধ্য দিয়ে। বোঝা গেল, তাঁদের 'দাবি মানো, নয় গুলি করো'র লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি কেন সিপিএম সরকার কলকাতায় করতে দিল না। এই অবস্থান লাগাতার চলতে থাকলে গ্রাম বাংলার বেদনা-হাহাকারের মর্মান্তিক চিত্র এবং মানুষের সরকারবিরোধী তীব্র ঘৃণা রাজ্যজুড়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত। তাই আতঙ্কিত সিপিএম নেতারা রাজ্য প্রশাসনকে দিয়ে ষড়যন্ত্র করে অবস্থান কর্মসূচি আটকে দিলেন।

সেচ ব্যবস্থা নামমাত্র

সরকার বলে চলেছে, তাদের গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির অন্যতম বিষয় সেচব্যবস্থা। তারা ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৭০ শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছে। আমরা গণদাবী'র পৃষ্ঠায় দেখিয়েছি যে, বাস্তবে সেচ আছে রাজ্যের ৩০ শতাংশেরও কম জমিতে এবং তার আবার ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে কৃষকেরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্যালো টিউবওয়েল ইত্যাদি বসিয়ে সেচের কাজ চালাচ্ছেন। সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকা অতি নগণ্য। দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া থেকে ধাইচু সিংহ এসেছিলেন কলকাতায় কৃষক ও খেতমজুরদের মহামিছিলে যোগ দিতে। ৪ বিঘা জমিতে ধান, পাট, শাক-সবজি চাষ করেন। সেচের ব্যবস্থা আছে? প্রশ্ন শুনে বললেন, 'স্যালো-র জলে চাষ হয়।' সরকার বসিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়? বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলেন, 'সরকার! তাদের কত কাজ! এসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ভাববার সময় কোথায়? নিজেদের উদ্যোগে আমরা স্যালো করেছি।' তাহলে সরকার যে বলছে, তাদের সুশাসনের জন্যই গ্রামবাংলায় কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে? ধাইচু সিংহের মুখে বিদ্রূপের হাসি। বললেন, 'সেইজন্য সর্বত্র সার নিয়ে কালোবাজারি চলছে। আমরা সরকারি রেটে সার পাচ্ছি না। আড়াই গ্রাম টমেটো বীজের দাম ২৫০-৩০০ টাকা, কোথাও বা ৪০০ টাকা। ধানের বীজ কিনতে গেলে ৫০-৬০ টাকা কেজি।' তারপর তাঁর বেদনাভরা জিজ্ঞাসা, 'আমরা গরিব মানুষ, এই দামে বীজ-সার কিনে কি চাষ করা সম্ভব?' রাইটার্সের ঠাণ্ডাঘরে বসা সরকারের মন্ত্রীরা গ্রামবাংলার গরিব চাষিদের এই বেদনা কি শুনতে পান? রুইদাসা গ্রামের আর এক গরিব চাষি বললেন, 'আড়াই-তিন বিঘা জমিতে চাষ করি। এখন পাট চাষ হবে। কিন্তু ক্যানেলে জল নাই তো। মাটি শুকায়ে বালি হয়ে গেছে। আকাশের জল না পড়লে পাট বোনা যাবে না। পাটের, শাক-সবজির দামও বাজারে পাচ্ছি না।' মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর থানার টেঁকারাইপুরের দু-বিঘা জমির চাষি রহমান সেখও বললেন, 'চাষ হয় বর্ষায়। ডিজেলের যা দাম, বীজ-সারের যা দাম তাতে খরার সময় চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না। একটা ডিপ-টিউবওয়েল ছিল। সরকার থেকে দেখে না।'

সেচের সামান্য যেটুকু সুযোগ আছে, তাও সংস্কারের অভাবে বিপন্ন। সেগুলির সংস্কারের কোনও ব্যবস্থা সরকার করেনি। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ থানার ললিতাবাড়ির চাষি জসিমুদ্দিন আহ্‌মেদ-এর বিঘা আটেক জমিতে দু'বার চাষ হয়। এখন বোরো চাষ হচ্ছে। তিস্তা নদীর জলে চাষ।

ছয়ের পাতায় দেখুন

১২টি রাজ্যে ৪০টি লোকসভা আসনে এবং ওড়িশায় ৩টি ও অন্ধ্রপ্রদেশে ২টি বিধানসভা আসনে এস ইউ সি আই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

পূর্ণাঙ্গ তালিকা ৮-এর পাতায়

তৃতীয় ফ্রন্ট, নাকি দরকষাকষির সুবিধাবাদী মঞ্চ

লোকসভা নির্বাচনের ঘোষণা হতেই সিপিএম নেতারা রাজনীতির ময়দানে আবার নেমে পড়েছেন তাঁদের 'তৃতীয় ফ্রন্ট'-এর ধুলোপড়া পুরনো ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন নিয়ে। চূড়ান্ত সুবিধাবাদী আঞ্চলিক স্তরের কিছু দলের নেতাদের জড়োও করে ফেলেছেন তাঁদের চারপাশে, যাঁরা অন্তত এখনি তাঁদের স্লোগানে গলা মেলাতে রাজি হয়ে গেছেন। ১২ মার্চ কর্ণাটকের টুমকুরে এক সভায় 'তৃতীয় শক্তি'র আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছেন সিপিএম সহ এই জোটের অন্তর্ভুক্ত নেতারা এবং দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে তাঁদের এই প্রয়াসে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। অবশ্য তাঁরা এই জোটকে কোনও মোর্চা বা ফ্রন্ট বলতে রাজি হননি। বলেছেন, ''এটি কোনও মোর্চা নয়। সমমনোভাবাপন্ন দলগুলি এক হয়ে কংগ্রেস এবং বিজেপিকে পরাস্ত করার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাবে। লক্ষ্য হল, দেশে অ-কংগ্রেস, অ-বিজেপি বিকল্প সরকার গঠন।'' (গণশক্তি : ১৬.০৩.০৯)। স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন ওঠে যে, প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারকে সমর্থন করে আসা এবং তার থেকে সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধা নেওয়া সিপিএমের হঠাৎ কী প্রয়োজন পড়ল বিকল্প সরকার গঠনের? তবে কি সিপিএম এবং তাদের জোটানো দলগুলির কংগ্রেস এবং বিজেপি সম্পর্কে বোধোদয় হয়েছে, এদের নীতিগুলিকে তারা জনবিরোধী বলে মনে করছেন এবং তার বিরুদ্ধে জনমুখী পাল্টা কোনও কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন? দেখা যাক, সিপিএম নেতাদের 'সমমনোভাবাপন্ন' দলগুলি কারা, তারা কে কতখানি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ এবং কংগ্রেস ও বিজেপি বিরোধী।

বামফ্রন্টভুক্ত চার বাম দল ছাড়া এর মধ্যে রয়েছে চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগু দেশম পার্টি (টিডিপি), এইচ ডি দেবেগৌড়ার জনতা দল সেক্যুলার (জেডিএস), অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি (টি আর এস), নবীন পট্টনায়কের বিজু জনতা দল (বিজেডি), জয়ললিতার এ আই এ ডি এম কে। আর মায়াবতী জানিয়েছেন, তাঁর দল বিএসপি এই জোটের সাথে নয়, পাশে আছে। দেখা যাক, এই জোটের দলগুলি কতখানি সমমনোভাবাপন্ন।

তেলেগু দেশমের চন্দ্রবাবু নাইডু প্রথমে ছিলেন কংগ্রেসে, পরে টিডিপিতে। এন ডি এ আমলে ছিলেন বিজেপির শরিক। তার আগে ছিলেন যুক্তফ্রন্টে। ভোটের আগে এখন তিনিই তৃতীয় ফ্রন্টের নেতা, ঘোরতর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী।

এইচ ডি দেবেগৌড়ার রাজনৈতিক জীবন অতীব বর্ণময়। '৯৬ সালে কেন্দ্রে সংযুক্ত মোর্চা সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দশ মাস কাটিয়েছিলেন তিনি। '০৪ সালে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল জেডিএস তৃতীয় স্থান দখল করে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে থাকে বিজেপি ও কংগ্রেস। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে আর এক 'সেক্যুলার' কংগ্রেসের সঙ্গে সরকার গঠন করে ফেলেন তিনি। এবং কুড়ি মাস সেই সরকার চালান। এরপর তাঁর স্বেচ্ছাচারিতায় বিরক্ত কংগ্রেস যখন তাঁর দলের একাংশকে ভাঙিয়ে নিয়ে সরকার গড়তে উদ্যত

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিপ্লবী প্রবোধরঞ্জন সেন স্মরণসভা

১৮ মার্চ বিকাল ৫টায় কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে বিপ্লবী প্রবোধরঞ্জন সেন স্মরণে সারা বাংলা ক্ষুদিরাম আত্মোৎসর্গ শতবর্ষ কমিটি ও অল বেঙ্গল কমিউনাল হারমনি কমিটির আহ্বানে এক মহতী স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির সদস্য সদানন্দ বাগল, চট্টগ্রাম পরিষদের সম্পাদক সরোজরঞ্জন চৌধুরী, সারা বাংলা শহীদ ক্ষুদিরাম আত্মোৎসর্গ শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির সম্পাদক কমল সাঁই। প্রয়াত বিপ্লবীর প্রতিকৃতিতে এঁদের মাল্যদানের পর একে একে শ্রদ্ধা জানান তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা নীলিমা সেনগুপ্ত, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় প্রণব কানুনগো, সূর্য সেন শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষে সম্পাদক চন্ডীদাস ভট্টাচার্য, নজরুল সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষে সম্পাদক সান্টু গুপ্ত, ক্ষুদিরাম আত্মোৎসর্গ শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক আয়সানুল হক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-শিক্ষাকর্মী যুক্তমঞ্চ এবং কলেজ স্ট্রীটের ফেবারিট কেবিনের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়।

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের ধর্না-ডেপুটেশন

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম-এর ইউকো ব্যাঙ্ক ইউনিটের পক্ষ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ইউকো ব্যাঙ্কের হেড অফিসের সামনে সারাদিনব্যাপী ধর্না কর্মসূচি পালিত হয়। ৭০০০-এর বেশি ক্লার্ক, ৩০০০-এর বেশি সাবস্টাফ, ১০০০-এর বেশি আর্মড গার্ডের শূন্যপদ পূরণ, পার্টটাইম সুইপারদের ফুলটাইম করা, ক্যাজুয়াল সাবস্টাফ ও ক্যান্টিন স্টাফদের স্থায়ীকরণ ও সকলের জন্য পেনশনের দাবিতে এবং আউটসোর্সিং ও কন্ট্রাক্ট প্রথার বিরুদ্ধে এই ধর্নামঞ্চে ইউকো ব্যাঙ্কের পশ্চিমবঙ্গের এবং বাইরের অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন শাখার কর্মচারীরা অংশ নেন। ধর্নামঞ্চে বিভিন্ন বক্তা ব্যাঙ্কে নিযুক্ত ক্যাজুয়াল, কন্ট্রাক্ট ও পার্টটাইম কর্মচারীদের কী ধরনের কাজের বোঝা বইতে হয়, তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সেই কর্মচারীদের স্থায়ী ফুলটাইম কর্মীতে পরিণত করার দাবি জানান। বক্তারা কর্মীদের পেনশন দেওয়ার সমস্ত ব্যয়ভার ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকেই বহন করার দাবি জানান। যে পেনশন বর্তমানে চালু আছে, তার পরিবর্তে কর্মচারীকেই পেনশনের ব্যয় বহন করতে হবে, এই শর্ত সম্বলিত নতুন পেনশন স্কিম চালু করার যে প্রয়াস চলছে, তাকে ব্যর্থ করার জন্য ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের তাঁরা আহ্বান জানান। বেতন কাঠামো সংশোধনের জন্য নবম দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন নিয়ে টালবাহানার প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের দাবিসনদের ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের জন্য সকল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

সিপিআই, সিপিএম যেসব রাজ্যে সরকারি ক্ষমতায় থেকে কর্মচারীদের স্বার্থবিরোধী নীতি কার্যকরী করছে, সে সব রাজ্যে তাদের পরিচালিত ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন তার বিরোধিতা করতে পারে না বলে সমস্ত বক্তাই তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন।

বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জগন্ময় রায়মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস, ইউকো ব্যাঙ্ক ইউনিটের সম্পাদক আলোকতীর্থ মণ্ডল এবং সভাপতি অরূপ রতন সাহা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বসন্ত রায়, মেহেবুব আমেদ, রানা চক্রবর্তী, কে জি সাহা। ধর্নামঞ্চ থেকে এক প্রতিনিধিদল ইউকো ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন।

‘ধনীরাই চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে’

পাটনায় মেডিকেল ওয়ার্কশপে বললেন চিকিৎসকরা

১-২ মার্চ পাটনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার-এর পক্ষ থেকে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল, ‘স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকরণের প্রভাব’ এবং ‘চিকিৎসা ব্যবস্থায় নৈতিকতার সংকট’। এই ওয়ার্কশপ-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডাঃ এস এল মণ্ডল, সভাপতিত্ব করেন এম এস সি বিহার শাখার আহ্বায়ক ডাঃ ক্যাপটেন পি সি সিংহ, প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ডাঃ তরুণ মণ্ডল।

প্রথম দিন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকরণের প্রভাব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তারা পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ, ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন, ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশনের বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০০২-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ডব্লুটিও, আই এম এফ, এডিবি প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে এদেশে আনার চেষ্টা করছে।

দ্বিতীয় দিন মেডিকেল এথিকস্-এর সংকট বিষয়ে আলোচনা করেন ডাঃ ক্যাপটেন পি সি সিংহ, ডাঃ তরুণ মণ্ডল, ডাঃ সুজিত চৌধুরী, ডাঃ গোপাল মাহাতো, ডাঃ রাজেন্দ্র সিং প্রমুখ।

ত্রিপুরায় মারণব্যাধি মেনিনজাইটিস প্রতিরোধের দাবিতে বিক্ষোভ

কয়েক মাস যাবৎ রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল লংতরাই ভ্যালিতে মারণব্যাধি মেনিনজাইটিসের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। বহু মানুষের মৃত্যুর পরও বামফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর রোগের কারণ নির্ণয় করতে পারেনি। ইতিমধ্যে এই রোগ সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় এস ইউ সি আইয়ের উদ্যোগে ৫ মার্চ মেনিনজাইটিস প্রতিরোধের দাবিতে এক বিক্ষোভ মিছিল আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এক প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান করে। দাবি করা হয় ঃ (১) যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেনিনজাইটিস প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে, (২) রাজ্যের সর্বত্র মেনিনজাইটিস প্রতিষেধক সরবরাহ করতে হবে, (৩) প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থায়ী সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে, (৪) আগে থেকেই আন্ত্রিক ও ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং (৫) মেনিনজাইটিস রোগে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পরে বটতলায় অনুষ্ঠিত এক বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে জনসাধারণের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

ব্যাপক লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে অ্যাবেকার বিক্ষোভ

পরীক্ষা চলাকালীন এবং বোরো চাষের সময়ে ব্যাপক লোডশেডিংয়ের বিরুদ্ধে অ্যাবেকার আহ্বানে ১৩ মার্চ কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার বিদ্যুৎ গ্রাহকরা রাস্তা অবরোধ, জেলাশাসক দপ্তর এবং বিদ্যুৎ অফিসে ডেপুটেশন, বিক্ষোভ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করেন।

কলকাতার গ্রাহকরা মেট্রো চ্যানেলে জমায়েত হয়ে মিছিল করে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে উপস্থিত হলে পুলিশ তাঁদের গতিরোধ করে। গ্রাহকরা সেখানেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে সি ই এস সি-র পক্ষ থেকে সিস্টেম কন্ট্রোলের জি এম এবং ডি জি এম (সেন্ট্রাল) গ্রাহক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসেন এবং জানান, পরীক্ষা চলাকালীন লোডশেডিং যাতে না হয় তার জন্য তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

পূর্ব মেদিনীপুরে তমলুক শহরের হাসপাতাল মোড়ে গ্রাহকরা লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে পথ অবরোধ করেন। তাঁরা জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেন এবং দাবি করেন, নদীর জল লিফ্‌টিং সিস্টেমের মাধ্যমে বোরো চাষিদের সরবরাহ করতে হবে।

উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া গ্রুপ সাপ্লাই অফিসে গ্রাহকরা লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান এবং এস এম-কে ডেপুটেশন দেন।

বীরভূমে রামপুরহাট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেন গ্রাহকরা। মেদিনীপুর শহরে কালেকটরেট মোড়ে গ্রাহকরা লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করেন এবং ডি ই-র কাছে ডেপুটেশন দেন।

স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

২০০৩ সালে ছাতনার জোড়হিড়ার জনবহুল এলাকায় স্পঞ্জ আয়রন কারখানা স্থাপিত হয়। এখন মানুষ বুঝতে পারছেন যে, সেখানকার জল, মাটি, বাতাস কী বিপুল পরিমাণে দূষিত হচ্ছে। যাঁরা ভেবেছিলেন কর্মসংস্থান হবে, তাঁরাও হতাশ। ১৪ মার্চ এলাকার প্রায় তিন শতাধিক মানুষ জিড়রা অঞ্চল গণকমিটির উদ্যোগে দূষণ নিয়ন্ত্রণ, কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নিয়োগে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার সহ ১০ দফা দাবিতে মিছিল করে কমিটির সম্পাদক দয়াময় গরাই ও সভাপতি কানাইলাল সরেনের নেতৃত্বে কারখানার গেট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাঁকুড়ার শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সম্পাদক মধুসূদন দরিপা সহ অন্যান্যরা। আন্দোলনের চাপে কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনগণের সামনে এসে মাইকে দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। কমিটির দাবি মেনে ১০ দিনের মধ্যে বিডিও সহ সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে তিনি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দিলীপ কুণ্ডু।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই ও ভ্যাকসিনেটরদের সরকারি বঞ্চনার প্রতিবাদ

মাসে বেতন মাত্র ৫০ টাকা। ১৫-২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সারা পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দাই, ভ্যাকসিনেটর এবং সি এইচ জি কর্মচারীরা কাজ করে চলেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি দিলেও এদের সুস্থভাবে বাঁচার মতো কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। কোথাও কোথাও এক-দেড় বছরের বেতন বাকি। পশ্চিমবাংলায় দাই-এর সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার এবং ভ্যাকসিনেটর আরও কয়েক হাজার। এই বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্য কর্মচারী হাজার সমস্যায় জর্জরিত, তবু বৃদ্ধ বয়সেও বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন মানবিকতার কারণে। এক সময় এই স্বাস্থ্য কর্মচারীদের কিট ব্যাগ, বছরে ৬০০ টাকার ওষুধ ও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত গ্রামীণ মানুষদের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করার জন্য। আজ তাও বন্ধ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই বঞ্চনার প্রতিবাদে এবং গ্রুপ ডি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি ও বকেয়া বেতন অবিলম্বে প্রদানের দাবিতে ১৪ মার্চ তাঁরা ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিউনিটি হেলথ গাইড ইউনিয়নের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি কমিটির নেতৃত্বে শিলিগুড়ির হাসমি চকে গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক শঙ্কর পাল, হারাধন শর্মা, অতুলকৃষ্ণ রায়, ছায়া ঘোষ, সতীশচন্দ্র রায়, দীননাথ রায়, মঞ্জু রায় প্রমুখ।

বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা আন্দোলনে কেন

পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল প্রকাশের সাথে সাথে প্রথমে বর্ধমানের দুর্গাপুর বি সি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ঐ জেলারই 'কণাদ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট' — এই দু'টি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রবল ছাত্র বিক্ষোভ হয়। এরপর তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য জেলাতেও। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর, সোনারপুর ও বিষ্ণুপুরের তিনটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ দেখায় বাঁকুড়া জেলার কাঁকসায় ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে। সিউড়ির বীরভূম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করে ডিরেক্টরের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে ক্লাসঘরে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

সবক'টি কলেজেই ছাত্রবিক্ষোভের মূল কারণ সেমেস্টার পরীক্ষার খারাপ ফল। বিষয়ভিত্তিক ফল বিচার করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, মেকানিক্যাল, প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ও ফ্লুইড মেকানিক্স-এ কোনও কোনও কলেজে ফেলের হার ৭০ শতাংশেরও বেশি। ছাত্রদের অভিযোগ শুধু পরীক্ষার ফল নিয়ে নয়, এরকম ফল হওয়ার কারণগুলো দূর করার প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বিরুদ্ধেও। ছাত্ররা অভিযোগ করেছে, প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য যে ন্যূনতম পরিকাঠামো দরকার তা বহু কলেজেই নেই, নেই উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক। কিছুদিন আগে এই একই দাবিতে ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখিয়েছিল ডোমকল, আসানসোল ও উত্তর কলকাতার একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবি মানা তো দূরের কথা, উল্টে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল। কারণ এইসব কলেজে সর্বময় কর্তা হল মালিক, যে কলেজ খুলেছে লাভ করার জন্য। তারও আগে ২০০১ সালে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি নিতে বাধ্য হয়েছিল উপযুক্ত পরিকাঠামো ও পরীক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার দাবিতে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলেও পরিকাঠামোর সমস্যা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছে।

এই কলেজগুলিতে একটু খোঁজ নিলেই বোঝা যাবে, ছাত্রদের অভিযোগ আজও কতটা বাস্তব। বেশিরভাগ কলেজেই উপযুক্ত সংখ্যক বই নেই। অথচ বই দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাইব্রেরি ফি বাবদ মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়েছিল ছাত্রদের কাছ থেকে। ল্যাবরেটরির অবস্থাও প্রযুক্তি শিক্ষার উপযুক্ত নয়, এমনকী বহু কলেজে ওয়ার্কশপ নেই, বা থাকলেও তাতে আর যাই হোক, ছাত্রদের প্রশিক্ষণ হয় না। অথচ ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্কশপের জন্য ছাত্রদের আলাদা করে ফি গুনতে হয়। তা ছাড়া আছে মাসিক চার-পাঁচ হাজার টাকার টিউশন ফি। শুধু তাই নয়, অ্যাডমিশন ফি, পরীক্ষার ফি, ডেভেলপমেন্ট ফি-র মতো হরেকরকম ফি বাবদ মোটা টাকা গুনতে হয় ছাত্রদেরই। এত টাকা খরচ করে যে ছাত্রটি ভর্তি হল, সে যদি কলেজে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিকাঠামো দাবি করে, তা কি খুব অন্যায়? বেসরকারি কলেজের কর্তৃপক্ষ তাই মনে করে। তাই দেখা গেল এবারের ঘটনার পর ইতিমধ্যেই দুর্গাপুরের বি সি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৯ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে এফ আই আর করা হয়েছে এবং আন্দোলন করার 'অপরাধে' ৮৬ জন ছাত্রছাত্রীর উপর ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। তাছাড়া, ভবিষ্যতে তারা কোনও আন্দোলন-প্রতিবাদ করবে না — এই মর্মে তাদের মুচলেকাও দিতে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটা রিভিউ কমিটি গঠন করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করেছেন। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী সগর্বে জানিয়ে দিয়েছেন, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাজ্যে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। অতএব ছাত্রদের দাবির কোনও যৌক্তিকতা নেই।

বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলার ছাড়পত্র দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে, শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে এটা হল যুগান্তকারী পদক্ষেপ! আমাদের রাজ্যের ছাত্ররা নাকি দলে দলে উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই রাজ্যের মধ্যেই ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ ও পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তাঁরা এই ব্যবস্থা করছেন। অথচ বার বার এইসব কলেজে পরিকাঠামোর অভাব নিয়ে অভিযোগ উঠেছে, ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে, তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 'গর্বিত' ও 'উদ্ধত' মুখ দেখতে পাওয়া যায়নি। অতি মুনাফার উদগ্র লালসায় যে সব বেসরকারি মালিক ছাত্রদের কাছ থেকে শুধু টাকা নিচ্ছে, ন্যূনতম পরিকাঠামো গড়ে তুলছে না, তাদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়নি। বরং বর্তমানে ৬০টি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সাথে আরও ২৫টি নতুন কলেজ খোলার অনুমতি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। পুরনো কলেজে আসনসংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন ২৫টি কলেজ মিলে মোট ১৩ হাজার আসন বাড়ানো হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে, আর্থিক মন্দার জেরে যখন এমনিতেই চাকরির বাজারে টান পড়েছে, তখন এই বাড়তি আসন থেকে যারা পাশ করবে তাদের পরিণতি কী হবে? দ্বিতীয়ত, গত বছরই ১৯,৩২৪টি আসনের মধ্যে তিন-তিনবার কাউন্সেলিংয়ের পরও ৪০০ আসন খালি পড়ে ছিল। এরপর এই ১৩ হাজার বাড়তি আসনে ভর্তি হবে কারা? অতীতের মতোই এখনও পরিকাঠামোর প্রশ্নটি নিয়ে কর্তাব্যক্তিরা একটি শব্দও উচ্চারণ করছেন না। তাহলে কি এইসব কলেজকে ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করবার জন্যই?

শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের সূচনাতেই আমরা এই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলাম যে, এর ফলে শুধু যে শিক্ষার সুযোগ মুষ্টিমেয় ধনবানদের হাতে চলে যাবে তাই নয়, শিক্ষার মানেরও অবনমন ঘটবে। বিগত কয়েক বছর ধরে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মেধা তালিকায় তুলনামূলকভাবে উপরের দিকে থাকা মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারছে না, টাকার জোরে অনেক নীচে থাকা ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হচ্ছে। ফলে প্রতি বছরই ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হতে হতে কিছু কলেজে প্রথম সেমেস্টার-এর ক্লাস শুরু হচ্ছে দু'মাস পরে। ফলে নিম্ন মেধা এবং কম ক্লাস — এই দু'টির প্রভাবও পড়েছে পরীক্ষার রেজাল্টে। এইভাবেই শিক্ষাকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করার সুবাদে শিক্ষার মানের অবনমন হচ্ছে।

তাই যারা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ভাবতে অভ্যস্ত যে, বেসরকারীকরণ হলেই সবকিছুর মানোন্নয়ন হবে, বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে তাদেরও ভাবতে হচ্ছে এই ধারণাটা কত ভুল। শিক্ষার যথার্থ মানোন্নয়ন এবং সকলের জন্য শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে যেমন নতুন নতুন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে হবে, তেমনি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও ছাত্রদের বেতন কাঠামো এমন করতে হবে, যাতে তা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নাগালের মধ্যে থাকে। পাশাপাশি এইসব কলেজে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সরকারি নজরদারি সুনিশ্চিত করতে হবে।

মাইনে কাটা ও ছাঁটাই শ্রমিকরা উভয়েরই বিরোধী

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী সম্প্রতি বিভিন্ন শিল্পসংস্থার মালিকদের বলেছেন, 'মাইনে ছাঁটুন, শ্রমিক নয়'। প্রণববাবু এ কথা বলেছেন এমন একটা সময়ে, যখন বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ প্রবল মন্দাজনিত সংকটে পড়েছে এবং তার ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। ভারতেও ২০০৮ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এই তিন মাসেই শ্রমমন্ত্রকের লেবার ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ৫ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। বাস্তবে কর্মচ্যুত মানুষের সংখ্যা আরও বেশি। প্রতিদিনই ছাঁটাইয়ের খবর সংবাদমাধ্যমে আসছে। প্রধানমন্ত্রী সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা-মন্ত্রীরা যে বলেছিলেন, ভারতে মন্দার আঘাত পড়বে না, তাকে বিদ্রূপ করছে প্রতিদিন শ্রমিক-কর্মচারীদের ছাঁটাইয়ের ও মাইনে কমার খবরগুলি। এই মন্দার চাপ ঠেকানোর নামে সরকার দফায় দফায় আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করছে, কম সুদে ঋণ থেকে শুরু করে নানা রকম শুল্কে ছাড় দিয়েছে ব্যাপক হারে। এতে জনগণের কোনও উপকার হয়নি, শ্রমিক-কর্মচারীদের ছাঁটাইও কমেনি। কেবল পকেট ভরার বাড়তি সুযোগ পাচ্ছে মালিক ও ব্যবসায়ীরা। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় এভাবেই মন্দার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় শ্রমজীবী মানুষের ঘাড়ে, যাদের কোনও ভূমিকাই নেই এই মন্দা আসার পিছনে।

এই অবস্থাটা কোনও দেশের শাসকদলের পক্ষেই সুখকর নয়, বিশেষ করে নির্বাচন যদি দোরগোড়ায় থাকে। তাই কংগ্রেস এখন বোঝাতে চায়, তারা শ্রমজীবী মানুষের কথা খুব ভাবছে। কিন্তু পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী, উভয়ের স্বার্থ একই সাথে দেখার কথা বলাটা নেহাতই মূর্খামি অথবা মিথ্যাচার। তবুও সমস্ত বুর্জোয়া ও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলো এই বুলি আউড়ে নিজেদের মালিকস্বার্থ রক্ষার ভূমিকা ও চরিত্রকে শ্রমজীবী মানুষের সামনে থেকে আড়াল করতে চায়।

অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী সেই কৌশলেই মালিকদের উদ্দেশে বলেছেন, 'মাইনে ছাঁটাই করুন, চাকরি নয়'। এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে, মালিকরা মুনাফার হার অটুট রাখার জন্য মজুরি বাবদ ব্যয় কমাতে যে শ্রমিক ছাঁটাই করছে, সেটা না করে কেবল মজুরি বা মাইনের পরিমাণ কমিয়ে দিলেই তা সম্ভব। অন্যদিকে প্রণববাবুদের সরকার দেশের মানুষকে বলতে পারবে — দেখো, সরকার কেমন ছাঁটাই বন্ধ করেছে এবং ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী কত ভাল!

বিষয়টাকে আর একদিক থেকেও বিচার করা যায়। শ্রমিকদের চাকরি চলে যাওয়ার অর্থ আয়হীন হয়ে পড়া, যার পরিণাম পরিবার-পরিজন নিয়ে শ্রমিকের আর্থিক দুর্দশা, যা ক্রমে ক্রমে এমনকী অর্ধাহার ও অনাহারের দিকেও চলে যেতে পারে এবং তা যায়ও। অথচ ছাঁটাই না হয়ে মাইনে কমে গেলেও তো শ্রমিকের জীবনে তার পরিণাম শেষপর্যন্ত দুর্দশাই। মালিক তার মুনাফা অটুট রেখেই যৎসামান্য মাইনে শ্রমিকদের দেবে। এতে শ্রমিক বাঁচবে কি?

প্রণববাবু এই লোকঠকানো বুলির দ্বারা মালিকদের মুনাফার স্বার্থরক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। এই চালাকি শ্রমিকরা ধরতে পারবেই।

১৮ মার্চ ডব্লিউ বি পি টি এস ইউ-র নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীদের বিধানসভা অভিযানে পুলিশি বর্বরতা

সরকারি-আধাসরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বিধানসভা অভিযান

সরকারি-আধাসরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতাসীন সিপিএম সরকার কর্তৃক রাজ্যের ৫ম বেতন কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর করার নামে ২৭ মাসের প্রাপ্য বকেয়া টাকা থেকে বঞ্চিত করা, আড়াই লক্ষাধিক শূন্যপদে নিয়োগ না করা, কমিউনিটি হেলথ গাইড, গ্রামপঞ্চায়েতের ট্যাক্স কালেকটর, ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, হোমগার্ড, দৈনিক মজুরির কর্মচারী প্রমুখ অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিত কর্মচারী না করা ইত্যাদির বিরুদ্ধে ১৩ মার্চ যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের আহ্বানে বিধানসভা অভিযান হয়। কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ থেকে দুই সহস্রাধিক মানুষের বিক্ষোভ মিছিল রানি রাসমণি রোডে পৌঁছালে পুলিশ তাদের গতিরোধ করে।

সেখানে অনুষ্ঠিত সভায় বিধানসভার অন্যতম বিরোধী নেতা এস ইউ সি আই বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার সহ যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের আহ্বায়ক ফটিক দে, কার্তিক সাহা, অশোক মাইতি, মনোজ চক্রবর্তী, সাধন রায়, বিমল জানা, অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য, বিজয় ব্যানার্জী, মধু বেরা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশ থেকে একটি স্মারকলিপি বিধানসভার স্পিকারের উদ্দেশে প্রেরণা করা হয়। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও ঐ স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

‘দি অরিজিন অফ স্পিসিস’-এর ১৫০ বছর

ডারউইনবাদের বৈপ্লবিক তাৎপর্য

উনিশ শতকের শেষদিকের কোনও এক দিন জারশাসিত জর্জিয়ার তিফলিস শহরের এক ধর্মীয় স্কুলের একটি ছাত্র গ্লুরজিদজে তার ছাত্রবন্ধু সোসোকে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু কথা বলেছিল। কথাগুলো ধৈর্যের সঙ্গে শোনার পর সোসো বলে, ‘‘ওরা (ধর্মযাজকরা) আমাদের বোকা বানায়, ভগবান বলে কিছু নেই।’’

গ্লুরজিদজে — ‘‘এমন কথা আমি জন্মেও শুনিনি। এসব কী কথা তুমি বলছ সোসো!’’

‘‘ আমি তোমায় একটা বই পড়তে দেব। সেটা পড়লে তুমি বুঝতে পারবে, এই জগত ও জীবন্ত প্রাণীদের সম্পর্কে তোমার যা ধারণা, বাস্তব তার উল্টো। ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু বলা একেবারেই অর্থহীন। ’’

‘‘বইটা কী শুনি? কার লেখা?’’

‘‘ডারউইনের লেখা। এটা তোমার পড়া অবশ্যই দরকার।’’

এই সোসোই পরবর্তী জীবনে হয়েছিলেন সোভিয়েট সমাজতন্ত্র ও বিশ্বশান্তি আন্দোলনের মাথার মণি জোশেফ স্ট্যালিন। ডারউইনের বই তাঁকে নিরীশ্বরবাদীতে পরিণত করেছিল, যা পরবর্তী জীবনে তাঁর মার্কসবাদী হওয়ার জমি তৈরি করে। ১৮৫৯ সালে প্রথম প্রকাশের পরই ডারউইনের তত্ত্ব সাড়া ফেলে দেয়। একদিকে প্রচলিত চিন্তার ধারক-বাহক ও গির্জার কর্তারা তাঁর ওপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন, অন্যদিকে প্রগতিশীলদের মধ্যেও তাঁর তত্ত্ব নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। নিপীড়িত মানুষের মুক্তিপথের সন্ধানে বিজ্ঞানের প্রতিটি নতুন আবিষ্কারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন বলে ১৮৫৯ সালেই ডারউইনের তত্ত্বের বৈপ্লবিক তাৎপর্য ধরতে পারেন মার্কস ও এঙ্গেলস। কী সেই বৈপ্লবিক তাৎপর্য? ডারউইনের তত্ত্ব দেখায়, জীবজগৎ ও প্রকৃতিজগৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, জীববৈচিত্র্যের পিছনেও রয়েছে নিয়মশাসিত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং প্রাকৃতিক কারণেই জীবের বিবর্তন ঘটছে। অতিপ্রাকৃত শক্তি নয়, প্রাকৃতিক কারণই বিবর্তনের চালিকাশক্তি। এই বৈপ্লবিক তাৎপর্যের জন্যই ডারউইনের তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর এর পক্ষে ও বিপক্ষে ঝড় ওঠে।

ডারউইন প্রবর্তিত জীব-বিবর্তনবাদের (পরে শুধু বিবর্তনবাদ বলা হয়েছে) তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝতে হলে সর্বপ্রথম বোঝা দরকার ডারউইনের আগে জীববৈচিত্র্য ও জীবের পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষের ধারণা কেমন ছিল।

বাস্তবে ডারউইনের কিছু আগে থেকেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিবর্তনের ধারণা আসছিল। বিজ্ঞানের যে কোনও আবিষ্কারের পিছনে ব্যক্তির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, কিন্তু মূল চালিকাশক্তি হল বাস্তব অবস্থা ও সামাজিক চাহিদা। সমাজ পরিবর্তনের ধারায় উৎপাদনের প্রয়োজনকে ভিত্তি করে বিজ্ঞান এগিয়ে চলে। এই সত্য সমস্ত আবিষ্কারের পিছনে থাকলেও সর্বদা তাকে স্পষ্ট করে দেখা যায় না। কিন্তু ডারউইনের তত্ত্ব আবিষ্কারের পিছনে এই সামাজিক চাহিদার ভূমিকাটা খুবই দৃষ্টান্তমূলক। কীভাবে একের পর এক বিজ্ঞানীর সাধনা বিবর্তনবাদ আবিষ্কারের জমি তৈরি করেছিল, তা খুবই স্পষ্ট। চার্লস ডারউইনের ঠাকুর্দা এরাসমাস ডারউইন (১৭৩১-১৮০২) এক ধরনের বিবর্তনের ধারণা তুলে ধরেছিলেন, যাকে বলা হত স্পেকুলেটিভ ইভলিউশন বা অনুমান-নির্ভর বিবর্তনবাদ। বিজ্ঞানের কিছু কিছু অগ্রগতি ও পাথরের নানা স্তর থেকে সংগৃহীত ফসিলের নিরিখে তাঁরা আন্দাজ করেছিলেন, বিবর্তনের পথেই জীবের ক্রমবিকাশ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমাণ তাঁদের হাতে ছিল না। এরাসমাস বলেছিলেন, সকল জীবের স্রষ্টা ঈশ্বর জীববৈচিত্র্য এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যা থেকে মনে হয় সকল জীবই এক আদি জীব থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে নবজাগরণের ধারায় অন্ধবিশ্বাস ও ভাববাদী চিন্তাধারার বিপরীতে যুক্তিবাদী চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য গড়ে ওঠা গুপ্ত সমিতি ‘ফ্রি-ম্যাসনের’ সদস্য ছিলেন এরাসমাস ডারউইন। এরাসমাসের গবেষণা চার্লসের বিবর্তনবাদ গড়ে ওঠার জমি অনেকটা তৈরি করেছিল। এডিনবরায় শিক্ষক রবার্ট গ্রান্টের মাধ্যমে লামার্কের গবেষণার সঙ্গে ডারউইন পরিচিত হন। লামার্কের তত্ত্বে আমরা পরে আসব।

ডারউইনের আগে বস্তুজগৎ ও জীবজগতের সৃষ্টি সম্পর্কে ভাববাদী ও বস্তুবাদী দু’ধরনের চিন্তাধারাই প্রচলিত ছিল। ভাববাদীদের সঙ্গে বস্তুবাদীদের ধারণার গুরুতর পার্থক্য সত্ত্বেও দুই ধারণাই ছিল মনগড়া ও সেই অর্থে অবৈজ্ঞানিক, পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত নয়। ঋক্‌বেদের দশম মন্ডলের ১২৯ সূক্তে বর্ণিত বিশ্বসৃষ্টির ধারণা ছিল মনগড়া ও অলীক। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টির ধারণাটাই ছিল প্রধান। বাইবেলে বলা হয়েছে, ঈশ্বর ছয় দিনে জগৎ নির্মাণ করার পর সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেন। আজ আমরা বস্তু ও জীবজগৎকে যেমন দেখি, সৃষ্টির পর প্রথম দিন থেকেই তা তেমনই ছিল এবং আজও আছে। মানুষ আরও একটা জিনিস দেখে আশ্চর্য হয়েছিল; তা হল, নানা প্রাণীর দেহের গঠন অদ্ভুতভাবে পরিবেশের উপযোগী। জলবাসী মাছ আর উড়ুক্কু প্রাণীর মধ্যে দেহগঠনের পার্থক্য লক্ষণীয়। গোটা জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ খাদ্য-খাদক শৃঙ্খলে বাঁধা। হরিণের জন্য ঘাস, বাঘের জন্য হরিণ— এইভাবে যে জগৎ সৃষ্টি, তার পেছনে নিশ্চয় একটা নকশা আছে এবং নিশ্চয় একজন নকশাকার আছেন। তিনি হলেন সর্বজীবের স্রষ্টা ঈশ্বর। ভাববাদীরা এইভাবে যুক্তি করলেও বস্তুবাদীরা সে যুগেও তা করেননি। প্রাচীন গ্রিসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী থালেস মনে করতেন, জল থেকেই প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। থালেসের শিষ্য আনেক্সিমিন্দার (৬১০-৫৪০ খ্রিঃপূঃ) মনে করতেন, অজৈব পদার্থ থেকেই জীবের উদ্ভব এবং জীবের ক্রমবিকাশের পথেই এসেছে মানুষ। প্রাচীন ভারতে নিরীশ্বরবাদী সাঙ্খ্য দর্শন কল্পনা করেছিল, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ থেকেই অবিশেষ (ভাবজগৎ) ও সবিশেষ (বস্তুজগৎ) সত্তার সৃষ্টি। তারপর বিবর্তনের পথে চব্বিশটি পর্যায়ক্রমে ভাব ও বস্তুর বিকাশ ঘটেছে। পাতঞ্জল যোগ ও কণাদের বৈশেষিক দর্শন ক্ষুদ্রতম বস্তুকণার সমবায়ে গঠিত পরিবর্তনশীল বিশ্বধারণা তুলে ধরেছে। এই সব ধারণাগুলি কাল্পনিক, বৈজ্ঞানিক নয়। এমনকী ভারতীয় পুরাণ যেখানে বলেছে, পুরাতন বস্তুর গর্ভ থেকেই নতুন বস্তুর জন্ম, তখন এই কথাটাও তারা বিজ্ঞানসম্মত সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে বলেনি।

ভারতবর্ষের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম সাঁওতালরা মনে করে, হাঁস ও হাঁসিলের ডিম থেকে আদি পিতা পিলচুহাড়াম ও আদি মাতা পিলচু বুড়ির জন্ম। বর্তমানের সকল মানুষই এঁদের সন্তান। এই ধারণার মধ্যে জীবের জন্মের বস্তুগত প্রক্রিয়া একভাবে স্বীকৃত হলেও, ধরা হয়েছে আদি মানবও আজকের মানুষের মতো ছিল। অর্থাৎ প্রজাতির বিবর্তন স্বীকৃত হয়নি। সাঙ্খ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের মধ্যে প্রজননের অভিজ্ঞতার ছাপ থাকলেও প্রকৃতি বলতে এমন এক অনির্বচনীয়, সর্বব্যাপক সত্তাকে বোঝানো হয়েছে, যাকে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ইংরেজিতে ‘ইথার’ বলেছেন। সেইদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হবে, এই তত্ত্ব মনে করে, পুরুষের সংস্পর্শে কাল্পনিক অনির্বচনীয় প্রকৃতি থেকে জীবের সৃষ্টি। অর্থাৎ ডারউইনের আগে, এমনকী বহু আগে বস্তুবাদীদের কারও কারও চিন্তায় বিবর্তন সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদী (ইম্পিরিক্যাল) স্বীকৃতি থাকলেও, প্রাকৃতিক কারণে কীভাবে জীবের বিবর্তন ঘটে তার কোনও ধারণাই ছিল না।

ইউরোপে প্রচলিত বাইবেলের ধারণার কথা আগেই বলা হয়েছে। আইরিশ পাদ্রি জেমস আসার এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জন লাইটফুটের গণনার ওপর ভিত্তি করে সে সময়ে ধরা হয়, পৃথিবীর বয়স প্রায় ছয় হাজার বছর। সেক্সপীয়রের ‘মাচ অ্যাডো অ্যাব্যাউট নাথিং’ নাটকের চরিত্রের মুখেও শোনা যায় যে, পৃথিবীর ছয় হাজার বছরের ইতিহাসে কোনও পুরুষ কোনও নারীর জন্য আত্মহত্যা করেনি। অর্থাৎ তখনও ধারণা ছিল, পৃথিবীর বয়স ছয় হাজার বছর। ভূবিজ্ঞানের হিসাবে ছয় হাজার বছর খুবই সামান্য সময়। এইটুকু সময়ে জীবজগতের বিবর্তনের ধারায় কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না। একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ৫০-৬০ বছরের অভিজ্ঞতায় শৈশব থেকে বার্ধক্যে পৌঁছনো ছাড়া, প্রজাতির বিবর্তনের অর্থে কোনও পরিবর্তন দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদীরা জানেন, নিছক পঞ্চেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে মনগড়া তত্ত্ব খাড়া করার নাম বস্তুবাদী জ্ঞান নয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এক ও অভিন্ন নয়। মানুষ পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণের মারফত সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এইভাবে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বিবর্তনবাদ আবিষ্কারের পিছনে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিশেষ করে বিজ্ঞানের দু’টি শাখা ভূবিদ্যা ও তুলনামূলক অ্যানাটমির অগ্রগতি ডারউইনের বিবর্তনবাদ আসার জমি প্রশস্ত করে দেয়। ভূবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কৃষি ও বাণিজ্যবিস্তার, উৎপাদনের প্রয়োজনে খনিজ পদার্থ আহরণের তাগিদ থেকে নৌ-চালনা ও ভূগোলবিদ্যার বিকাশ। আবার সামগ্রিকভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের ও আধুনিক যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশের পিছনে রয়েছে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত বাণিজ্যবিস্তার ও নবজাগরণের তাগিদ।

ইউরোপে বন্ধ্যা সামন্তী উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে শিল্পবিপ্লবের যে জোয়ার আসে, তাতে মানুষের চিন্তার জগতে বিশাল ঢেউ ওঠে। জ্ঞানের পুরনো সংকীর্ণ সীমা ভেঙে যায়। ইউরোপের বাণিজ্যবিস্তার ও নৌ অভিযান, বিশেষত ভাস্কো-দা-গামা ও কলম্বাসের অভিযান প্রাচীন যুগের সর্বজনস্বীকৃত পণ্ডিত টলেমি বর্ণিত বিশ্বের মানচিত্র বদলে দেয়। একের পর এক নানা অভিযানে নানা দেশের নদী, পর্বত, ভূত্বকের গঠন, শিলাস্তরের গভীরতা দেখে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, বাইবেলের ব্যাখ্যা ঠিক নয়। ছয় দিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়নি। বীগল জাহাজে চড়ে এধরনেরই একটা নৌ-অভিযান ডারউইনের চিন্তার আমূল বদল ঘটায়। সেকথায় আমরা যথাসময়ে আসব। বিস্তৃততর পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে মানুষ দেখে যে, পাহাড়ের উপরে সামুদ্রিক প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যাচ্ছে, যেমন আমাদের দেশে হিমালয় পর্বতে এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়, যাকে আমরা সাধারণত শালগ্রাম শিলা বলে থাকি। এমনটা তখনই সম্ভব, যদি সুদূর অতীতে কোন সময়ে ওই পর্বত জলের তলায় থাকে। তাছাড়া পাথরের নানা স্তরে আটকে থাকা প্রাচীন প্রাণীর জীবাশ্ম দেখে মানুষ আরও বুঝতে পারে যে, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে জীবজগত বর্তমানের মতো ছিল, বাইবেলের এই ধারণাও ঠিক নয়। কালের ধারায় বহু জীব অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই সমস্ত প্রাপ্ত তথ্যকে মেলাতে গেলে বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বকে বাতিল করতে হয় ও পৃথিবীর বয়স আরও বেশি ধরতে হয়। ফরাসি পণ্ডিত কঁতে দ্য বুঁফো অনুমান করেন, পৃথিবীর বয়স পঁচাত্তর হাজার বছর হতে পারে। ফরাসি বিপ্লবের তত্ত্বগত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের জ্ঞান জগতে বিরাট পরিবর্তন ঘটানোর সংগ্রামে নিয়োজিত এনসাইক্লো-পিডিস্টদের অন্যতম এবং বিপ্লবের প্রথম সারির পুরোধা ডেনিস দিদারের বন্ধু ছিলেন বুঁফো। আজ ভূবিজ্ঞানের অনেক অগ্রগতি ঘটার ফলে আমরা জানি, বুঁফোর অনুমান ঠিক নয়, পৃথিবীর বয়স পঁচাত্তর হাজার বছরের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু বুঁফোর প্রচেষ্টার তাৎপর্য বিরাট। প্রথমত তিনি বাইবেলের প্রশ্নাতীত অথরিটিকে চ্যালেঞ্জ করেন। তাছাড়া তিনি পৃথিবীর বয়স নির্ধারণের জন্য মনগড়া ধারণার বদলে পরীক্ষানিরীক্ষা করে সত্যে পৌঁছনোর চেষ্টা করেন। তিনি গলিত লোহার পিণ্ড ঠান্ডা হয়ে জমতে কতটা সময় নেয়, তা নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করেন। আজ আমরা বহু পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের পর জানি, পৃথিবীর বয়স সাড়ে চারশো কোটি বছরের মতো। পৃথিবীর বুকে প্রাচীনতম যে পাথরের বয়স নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা গিয়েছে,তার বয়স ৩৮০ কোটি বছর। বুঁফো অনুসৃত পদ্ধতিতে এত দীর্ঘ বয়সের হিসাব পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু যেটা লক্ষণীয় তা হল, বুঁফো যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তার সীমাবদ্ধতা যাই-ই থাক, তা ছিল বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষার বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

মধ্যযুগে ঈশ্বরবাদীদের বাদ দিলে, বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানবাদীদের মধ্যে পৃথিবীর ও জীবজগতের উদ্ভব নিয়ে একাধিক মতবাদ চালু ছিল। একদল মনে করতেন, জল থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি। রোমান সমুদ্রের দেবতা নেপচুনের নাম থেকে এদের বলা হত নেপচুনবাদী। অপর একদল মনে করতেন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকেই জগতের সৃষ্টি। অগ্ন্যুৎপাতের দেবতা ভালকানের নাম অনুযায়ী এদের বলা হত ভালকানবাদী। একইরকমভাবে যাঁরা মনে করতেন, পৃথিবীর পেটের ভেতর থেকে সৃষ্টি হয়েছে ভূত্বকের পাথর, তাদের বলা হত প্লুটোবাদী। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, উৎপাদন ও বাণিজ্যের তাগিদে মানুষের নানা অভিযানের ফলে পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়তে থাকায় পুরনো ধারণা দিয়ে আর চলছিল না। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে, মহান ফরাসি বিপ্লবের অল্প পরেই ভূবিজ্ঞানী জেমস হাটন বলেন, পৃথিবীর সৃষ্টিকাল এত প্রাচীন যে, তা নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। অত্যন্ত ধীর প্রাকৃতিক ভাঙাগড়ার গতিতেই ভূত্বকের সমস্ত শিলা গঠিত হয়েছে। হাটনের মতামতের ভিতরে বাইবেল বিরোধিতা ছিল প্রকট। তার চেয়েও বড় কথা, তদানীন্তন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মতামত ছিল পর্যবেক্ষণ নির্ভর, যাকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া শক্ত। বিজ্ঞানী মহলে জেমস হাটন স্বীকৃতি পেলেও সামগ্রিক সমাজের কাছে ব্যাপকভাবে গৃহীত হননি। আরও বছর ত্রিশেক পরে হাটনের ধারায় চার্লস লায়েল ভূবিদ্যাকে নতুন ও আধুনিক স্তরে তুলে আনেন। লায়েল ভূবিদ্যায় যে মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন, তার মধ্যে অন্তত দু’টি বিবর্তনবাদের স্তম্ভ হিসাবে কাজ করেছে। এর প্রথমটি হল, পৃথিবীর বয়সের হিসাব সংক্রান্ত। লায়েল দেখান, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও পৃথিবীর গঠনগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর। তাকে ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে গেলে পৃথিবীর বয়সকে অনেক বেশি ধরতে হবে। দ্বিতীয়ত বাইবেল কথিত সৃষ্টিতত্ত্ব এবং মহাপ্রলয়ের পর নোয়ার নৌকায় রক্ষিত জীব থেকে জীবজগতের পুনঃসৃষ্টির ধারণাকে লায়েল বস্তুনিষ্ঠ তথ্যপ্রমাণ দিয়ে নিঃশংসয়ে খণ্ডন করেন। বস্তুত, চার্লস লায়েলের হাত ধরেই ভূবিদ্যা ও ভূপৃষ্ঠের

পাঁচের পাতায় দেখুন

তৃতীয় ফ্রন্ট, নাকি দরকষাকষির সুবিধাবাদী মঞ্চ

একের পাতার পর

হল, তখন সকলকে চমকে দিয়ে তিনি, যে সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে এতদিন অত্যন্ত ‘ঘৃণা করতেন’, তার সঙ্গে জোট বেঁধে ফেললেন এবং ছেলে এইচ ডি কুমারস্বামীকে করে দিলেন সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। আর প্রকাশ্যে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে বলতে লাগলেন, তিনি এ সবের কিছুই জানেন না, সবই তাঁর ছেলের ‘কীর্তি’। এইভাবে আরও কুড়ি মাস বিজেপির সাহায্যে পিতা-পুত্রে ক্ষমতা ভোগ করলেন। সেই দেবেগৌড়া আজ আবার জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্ব পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন এবং সিপিএম নেতাদের কাছে হয়ে গেছেন অসাম্প্রদায়িক এবং ‘অ-কংগ্রেস’, ‘অ-বিজেপি’ বিকল্প সরকার গঠনের এক হেভিওয়েট উদ্যোক্তা।

তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতির দাবি হচ্ছে, অন্ধ্রপ্রদেশকে ভেঙে আলাদা তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠন। দেখা যাচ্ছে, যে সিপিএম কিছুতেই বাংলা ভাগ হতে দেবে না বলে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে, তার ‘মনোভাব’ নির্বাচনী জাদুমন্ত্রে কেমন করে রাতারাতি বিচ্ছিন্নতাবাদী টিআরএস-এর সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সমান হয়ে গেল।

বিজেডি নেতা নবীন পট্টনায়ক বিজেপির সঙ্গে জোট করে ওড়িশায় গত এগারো বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সরকার চালিয়ে এলেন। তাঁর সরকার কলিঙ্গনগরে পস্কো বহুজাতিকের কারখানার জন্য পাঁচ হাজার একর জমি দখল করতে স্থানীয় আদিবাসীদের উৎখাত করতে গেলে তাঁরা বাধা দেন। বিক্ষোভ দমন করতে আদিবাসীদের ওপর গুলি চালায় নবীন পট্টনায়ক সরকারের পুলিশ। ১৩ জন আদিবাসীর মৃত্যু হয়। এ ব্যাপারে নন্দীগ্রামে গুলি চালিয়ে কৃষক হত্যা-করা সিপিএমের সঙ্গে বিজেডির ‘মনোভাবের’ মিল অবশ্যই আছে। ওড়িশায় কন্ধমালে খ্রিস্টানদের ওপর সংঘ পরিবারের ভয়ঙ্কর হামলার সময়ে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নবীন পট্টনায়ক কার্যত কোনও ব্যবস্থাই নেননি। তাঁর এই ভূমিকার তীব্র নিন্দায় এগিয়ে এসেছিলেন দেশজুড়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষ। সিপিএম নেতারাও সোচ্চার হয়েছিলেন। সম্প্রতি ভোটের হাওয়া বিজেপির পক্ষে ভাল নয় বুঝে বিজেপি শিবির ছাড়তেই সিপিএম নেতাদের কাছে নবীন পট্টনায়ক হয়ে গেলেন অসাম্প্রদায়িক! এই যাঁদের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধিতার নীতি, তাঁরা কতবড় ধুরন্ধর, তা বুঝতে দেশের মানুষের খুব অসুবিধা হবে কি?

এ আই এ ডি এম কে নেত্রী জয়ললিতা কংগ্রেস-বিজেপি, কখন কার সঙ্গে থাকেন তার হিসেব রাখতে রীতিমতো অঙ্ক কষতে হয়। ’৯১ সালে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গী হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আবার বিজেপির এন ডি এ সরকারেরও তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ এক শরিক। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি জোটের বিপর্যয়ের পর তিনি এখন তৃতীয় ফ্রন্টে সিপিএমের পরম বন্ধু! জয়ললিতার দুর্নীতি আজ ভারতখ্যাত। সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন স্বৈরাচারী এবং চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক কায়দায় যেভাবে দমন করেছিলেন তিনি, তার কথাও কারও অজানা নয়। সেদিন সিপিএম নেতারাও তাঁর এই ভূমিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। আজ সেই জয়ললিতা দিব্যি সিপিএম নেতাদের তৃতীয় ফ্রন্টের উপযোগী সর্বগুণান্বিত নেত্রীতে পরিণত হয়েছেন।

বিএসপি নেত্রী মায়াবতীর উত্থানই জাতপাতের রাজনীতিকে ভিত্তি করে। জাতের লড়াইকেই মুক্তির রাস্তা বলে বুঝিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের শোষিত-নির্যাতিত তথাকথিত নিচু জাতের মানুষকে। তাঁর দলের মূল স্লোগানই ছিল, ‘ব্রাহ্মণের গালে চার জুতো মারো’। তাঁর দুর্নীতিও জয়ললিতার থেকে কোনও অংশে কম নয়। একেবারে গরিব ঘর থেকে উঠে এলেও আজ মায়াবতী উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, চণ্ডীগড়, পাঞ্জাবে একাধিক সম্পত্তি ও খামারবাড়ির মালিক। সিবিআই তাঁর প্রায় তিরিশ কোটি টাকা নগদ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের খোঁজ পেয়েছিল। তা নিয়ে আজও মামলা চলছে। তাঁর এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সিপিএমও একসময় সোচ্চার হয়েছিল। এহেন মায়াবতী লোকসভায় পরমাণু চুক্তির ইস্যুতে আস্থা ভোটে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিতেই সিপিএমের কাছে ‘পবিত্র’ হয়ে উঠলেন। এমনকী সিপিএম নেতা প্রকাশ কারাট তাঁকে ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মেনে নিতেও আপত্তি নেই বলে ঘোষণা করে দিলেন।

সিপিএম যে দলগুলিকে নিয়ে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে, এই হচ্ছে তাদের চরিত্র। এবার আসা যাক, সিপিএম সহ বাম-নামধারী দলগুলির প্রসঙ্গে। সিপিএম এমন একটি দল, রাজ্যে রাজ্যে দু-একটি আসন পাওয়ার জন্য আঞ্চলিক, বিচ্ছিন্নতাবাদী, জাতপাতভিত্তিক, সাম্প্রদায়িক—কোনও দলের সঙ্গেই যার জোট করতে কখনওই নীতিতে আটকায়নি। অন্ধ্রপ্রদেশে কখনও তেলেগু দেশম, কখনও কংগ্রেস; তামিলনাড়ুতে কখনও করুণানিধি, কখনও জয়ললিতা; উত্তরপ্রদেশে কখনও মুলায়ম, কখনও মায়াবতী; পাঞ্জাবে কখনও অকালি, কখনও কংগ্রেস; অসমে কখনও অসম গণপরিষদ, কখনও কংগ্রেস — রাজ্যে রাজ্যে সিপিএমের জোট গড়ার এ রকম আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। আবার এ রাজ্যে তাঁরা যে বামফ্রন্ট তৈরি করেছেন, তার মধ্যেকার দলগুলির মধ্যেও মূলনীতিগত ঐক্য কতটুকু? সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সহ রাজ্যজুড়ে শিল্পের নামে সরকারি উদ্যোগে কৃষিজমি দখলের যে নীতির বিরুদ্ধে জনমত প্রবল আকার ধারণ করেছে, আরএসপি-ফরওয়ার্ড ব্লক সেই নীতির তীব্র বিরোধী বলে ঘোষণা করেছিল। আর এস পি নেতা ক্ষিতি গোস্বামী তো এমনকী এর প্রতিবাদে মন্ত্রীসভা ত্যাগের সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছিলেন। সিপিএম তার জনবিরোধী তথা শিল্পপতি-বন্ধু নীতি পরিবর্তন করেনি। তেমনই আর এস পি - ফরওয়ার্ড ব্লকই কি সিপিএমের চাপিয়ে দেওয়া শিল্পনীতি সম্পর্কে তাদের মত পরিবর্তন করেছে? তবুও নাকি তারা সমমনোভাবাপন্ন এবং পরস্পর জোট করতে তাদের কোথাও বাধেনি।

আটের পাতায় দেখুন

ডারউইনবাদের বৈপ্লবিক তাৎপর্য

চারের পাতার পর

বিবর্তনের ধারণা মনগড়া ধারণার গণ্ডি ছাড়িয়ে খাঁটি বিজ্ঞানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। লায়েলের ‘প্রিন্সিপল অব জিওলজি’ বইটি ছিল ডারউইনের সর্বক্ষণের সঙ্গী। পরবর্তী জীবনে ডারউইনের সঙ্গে লায়েলের বন্ধুত্ব হয়েছিল খুব গভীর। ডারউইন সর্বদা লায়েলের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন।

বিজ্ঞানের অপর যে শাখাটির অগ্রগতি বিবর্তনবাদ আসার জমি তৈরি করে, তা হল, তুলনামূলক অ্যানাটমি। মধ্যযুগে ইউরোপে মানবশরীর ব্যবচ্ছেদ করা ছিল বেআইনি, শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শারীরবিদ্যা শেখার অন্যতম উপায় ছিল, মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ। এভাবেই একজাতের লেজহীন উল্লুকের দেহ ব্যবচ্ছেদ করে গ্রিক পণ্ডিত গ্যালেন মানবশরীরের যে বর্ণনা দেন, তা বিনা প্রশ্নে প্রায় ১৪০০ বছর ধরে স্বীকৃত হয়ে আসছিল। কিন্তু নবজাগরণের জ্ঞানসাধকেরা শাস্তির ভয় উপেক্ষা করে, এমনকী কবর থেকে সদ্য পোঁতা মৃতদেহ রাতের অন্ধকারে চুরি করিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। নবজাগরণের শিল্পীরা প্রথম চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যকে বাস্তব করার প্রয়োজন থেকে শারীরসংস্থান পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নাম করতে হবে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির। ইউরোপের রেনেসাঁসের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হল্যান্ডের আমস্টারডাম শহরে প্রকাশ্যে শবব্যবচ্ছেদের প্রদর্শনী হতো, সেখানে ডাঃ টুলপের শবব্যবচ্ছেদের ছবি আঁকেন বিখ্যাত চিত্রকর রেমব্রান্ট। ১৫৪৩ সালে নবজাগরণের পীঠস্থান ইতালির পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্যবিদ্যার শিক্ষক আন্দ্রে ভেসালিয়ুস প্রকাশ্যে মৃত মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করেন, তিনি দিকপাল চিত্রকর টিশিয়ানের সাহায্য নেন ব্যবচ্ছেদের ছবি আঁকানোর জন্য। সেযুগে ফটোগ্রাফের আবিষ্কার হয়নি। টিশিয়ানের আঁকা ছবি কাঠের ব্লক করে ছেপে ভেসালিয়ুসের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘দ্য ফেব্রিকা’ প্রকাশিত হয়। রেমব্রান্ট ও টিশিয়ানের ছবিগুলি ছিল বাস্তব ও জীবন্ত। শারীরসংস্থান ও প্রাণীর অস্থিকাঠামো সম্পর্কে জ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে তুলনামূলক শারীরবিদ্যার অগ্রগতি ঘটতে থাকে। ডারউইনের প্রায় সমসাময়িক আর্নেস্ট হেকল (১৮৩৪-১৯১৯) মানুষের হাতের অস্থিকাঠামোর সঙ্গে বানরজাতীয় প্রাণীর হাতের অস্থিকাঠামোর তুলনা করেন এবং বানরজাতীয় প্রাণীর থেকেই মানুষের উদ্ভবের সম্ভাবনার কথা বলেন।

প্রজাতির (স্পিসিস) বিবর্তন ঘটে কি না—এই প্রশ্নে অপর যে দু’জনের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন, ক্যারোলাস লিনিয়াস এবং জে বি লামার্ক। ক্যারোলাস লিনিয়াস সমস্ত প্রাণীজগতের শ্রেণীবিভাজন(ক্ল্যাসিফিকেশন) করেন এবং বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের শারীরসংস্থানের তুলনামূলক আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল, প্রতিটি প্রজাতি নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত, এর কোনও হেরফের হয় না, প্রজাতির কোন বিবর্তনও হয় না। এই কথা আসলে শেষবিচারের বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে অনুরূপই দাঁড়িয়ে যায়। শল্যবিদ্যার জনক বলে পরিচিত জন হান্টারও তুলনামূলক বিচারের জন্য শত শত জীবের কঙ্কাল সংরক্ষণ করেন ও পর্যবেক্ষণ করেন। বুর্জোয়া প্রগতির এই যুগে জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সংকীর্ণ বিভাজন (কম্পার্টমেন্টালাইজেশন) ঘটেনি। হান্টার একই সঙ্গে শল্যচিকিৎসা, তুলনামূলক অ্যানাটমি ও ভূবিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করেছেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সামগ্রিকতা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অর্জিত বিশেষ জ্ঞানগুলির সাধারণীকরণ না হলে বিবর্তনবাদের মতো যুগান্তকারী তত্ত্বের আবিষ্কার সম্ভব ছিল না। প্রজাতির অপরিবর্তনীয়তার ধারণায় জোরালো আঘাত হানেন বুঁফোর ছাত্র ফরাসি বিজ্ঞানী জে বি লামার্ক (১৭৭৪-১৮২৯)। লামার্ক ১৮৭১-৭২ সালে ইউরোপের নানা স্থানে ঘুরে গাছপালা ও প্রাণীদের পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি দেখান, প্রাণীজগত ধাপে ধাপে সরল থেকে ক্রমশ জটিলতার দিকে গিয়েছে। বিকাশের সিঁড়ির ধাপ ধরে যত পিছন দিকে যাওয়া যাবে, ততই দেখা যাবে, প্রাণীর দেহগঠন সরলতর ছিল। এই বিবর্তনের একটা কারণও তিনি দেখান। তিনি বলেন, পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রাণী যে অঙ্গটির বেশি ব্যবহার করে, সেটি প্রয়োজনমতো বদলায় এবং পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য বংশগতির ধারায় উত্তরাধিকার হিসাবে জনক-জননী থেকে সন্তানদের উপরে বর্তায়। জিরাফের দৃষ্টান্ত দিয়ে লামার্ক বলেন, উঁচু গাছের ডাল থেকে পাতা খাওয়ার প্রয়োজন ও চেষ্টার ফলে জিরাফের গলা লম্বা হয়ে গিয়েছে। এধরনের আরও কিছু দৃষ্টান্ত লামার্ক তুলে ধরেন। নিকটতর কোনও বানরজাতীয় প্রাণীর বিবর্তনের ফলেই যে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, তাও লামার্ক আন্দাজ করেছিলেন। বস্তুনিষ্ঠ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও লামার্কের তত্ত্বে অর্জিত শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি বংশগতির ধারায় উত্তরাধিকারীর উপর বর্তানোর ক্ষেত্রে প্রাণীর ইচ্ছাশক্তির একটা নির্ধারক ভূমিকা থেকে যায়। পরে আমরা দেখব, ডারউইন বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন, যাতে তাঁর তত্ত্বে বিবর্তনের উপায় সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে ইচ্ছা বা চেতনার কোন ভূমিকা না থাকে। লামার্কের তত্ত্বে এই গুরুতর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় পরিবেশের ভূমিকার স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃতি আছে। লামার্কের তত্ত্ব গির্জার নির্দেশিত অবৈজ্ঞানিক ধারণার মূলে সজোরে আঘাত করে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে লামার্কের অবদানকে কোনমতেই খাটো করা চলে না।

আমরা আগেই দেখেছি, ডারউইনের আবিষ্কারের আগেই নানা বিজ্ঞানী নানাভাবে প্রজাতির বিবর্তন ও মানুষের আবির্ভাব সংক্রান্ত বস্তুনিষ্ঠ ধারণা তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু সেগুলির প্রধান সীমাবদ্ধতা হল, সেগুলি বহুলাংশে অনুমাননির্ভর ও ভাববাদী চিন্তার প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। ডারউইনের প্রধান কৃতিত্ব হল, বিবর্তনের চিন্তাকে পূর্ণতা দান ও তাকে ভাববাদী ঝোঁক থেকে মুক্ত করে পুরোপুরি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। কেন তিনি এটা করতে পেরেছিলেন, তা বোঝার জন্য ডারউইনের বেড়ে ওঠার পরিবেশটি কী ছিল তা জানা দরকার। ইউরোপে শিল্পসভ্যতার উদ্ভব, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও সংস্কারমুক্ত উদার মানসিকতার প্রসারের পরিবেশে ডারউইন বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁদের পরিবার ছিল ধনী, তাই ডারউইনকে পেট চালাবার চিন্তা করতে হয়নি। এই কারণে ইদানীং তাঁকে খাটো করার চেষ্টা চলছে, যেন ঘরে অভাব ছিল না বলেই তিনি বিজ্ঞানের সাধনা করতে পেরেছিলেন। গরিবের ঘরে তা সম্ভব নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইংল্যান্ডের অভিজাত পরিবারের সন্তানরা যখন টাকা রোজগার, বিলাসিতা আর শেয়াল শিকারের পিছনে ছুটতো, তখন ডারউইন ছুটেছিলেন জ্ঞানের সন্ধানে। সেইসময়ে সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা অতীব বিপজ্জনক জেনেও প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তিনি বীগল জাহাজে বিশ্বভ্রমণে বের হন। গির্জার কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ করে, এমন কিছু করা সে যুগে ছিল খুবই বিপজ্জনক। নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবন ত্যাগ করে সেই বিপদকে বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি। আমরা জেনেছি, চার্লসের ঠাকুর্দা এরাসমাস ছিলেন যুক্তিবাদী গুপ্ত সমিতির সদস্য। বর্ণবিদ্বেষবিরোধী, দাসপ্রথাবিরোধী উদারনৈতিক গণতন্ত্রের যে পরিবেশ চার্লস ডারউইনকে ঘিরে ছিল, সেখানে বলা হত, চামড়ার রঙ যাই হোক, চামড়ার নিচে সব মানুষই সমান। স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় মেডিকেল ছাত্র থাকাকালীন সেখানকার প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিবেশ ডারউইনকে মুক্তবুদ্ধির অনুরাগী করেছিল। পরবর্তীকালে তিনি আসেন কেমব্রিজে। সেখানে এক ধরনের আপসমুখী চিন্তা প্রচলিত ছিল, যাতে বলা হত, জগত ও প্রকৃতি নিয়মের দ্বারা চলে, কিন্তু সেই চলার পিছনে রয়েছে বিশ্বস্রষ্টার মাথা ও হাত। বিজ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বরবাদের মিশেল দেওয়া এই চিন্তা গণবিক্ষোভকে স্তিমিত করে রাখবে, ফেটে পড়তে দেবে না, এটাই ছিল সমাজপ্রভুদের ধারণা। এই ধরনের মিশ্র চিন্তা কেমব্রিজের রাজনৈতিক ও সমাজজীবনের একেবারে রক্ত মাংসের সঙ্গে মিশে ছিল। ডারউইনের মনোজগতে এডিনবরা ও কেমব্রিজ দুয়েরই ছাপ ছিল।

(চলবে)

সিপিএম সরকারের গ্রামোন্নয়নের প্রচার ডাহা মিথ্যা

একের পাতার পর

বললেন, 'তিস্তার জল ঠিকমতো আসে না। ক্যানেলের কাজ এখনও শেষ হল না।' দার্জিলিংয়ের ধাইচু সিংহের মতোই জসিমুদ্দিনও বললেন, 'সারের দামটা অত্যধিক। সার নিয়ে চলছে কালোবাজারি। ৯ টাকা ৬০ পয়সার ডিএপি সার বিক্রি ১৬ টাকায়। তাহলে, কী করে চাষ করবে কৃষক?' প্রশ্ন তো ওঠেই —সার নিয়ে রাজ্যজুড়ে এমন ব্যাপক কালোবাজারি চলছে নিশ্চিন্তে, একটি কালোবাজারিকেও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না; তাহলে কি রাজ্যে সরকার ও প্রশাসন বলে কিছু নেই? আছে বৈকি! সরকার ও তার পুলিশ-প্রশাসন যে আছে এবং অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকাতেই যে আছে, সেটা নজরে পড়ে তখনই যখন ক্ষিপ্ত চাষি-মজুরেরা ফড়ে-দালাল ও কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্যোগী হয়, দাবি না মানা পর্যন্ত যখন তারা গণঅবস্থানে বসার মরিয়া সঙ্কল্প ঘোষণা করে। অর্থাৎ চাষি-মজুর সাধারণ মানুষকে রক্ষার সময় নয়, ফড়ে ও কালোবাজারিদের রক্ষার সময়ই সরকার ও প্রশাসনের দেখা মেলে।

পুরুলিয়ায় সরকারি গ্রামোন্নয়নের চেহারা তুলে ধরলেন গোলামারা গ্রামের সেকেন্দার আনসারি ও যজ্ঞেশ্বর মাহাতো। তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'ধান বিক্রি কইরতে হচ্ছে এক কুইন্টাল ৬৩০ টাকা দরে। গ্রামে একটা নলকূপ নাই, একটা কুঁয়া নাই। একটা প্রাইভেট স্কুল আছে, দু' কিলোমিটার হবেক, সেখান থেকে পানীয় জল আনতে হয়।' কী চমৎকার গ্রামোন্নয়ন! বললেন, 'হাজার হাজার বিঘা জমিতে বর্ষাকালে জল থাকে। বর্ষা যেমনি শেষ হয়, জল শেষ হইয়ে যায়, চাষ হয় না।' সেচের বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় বললেন, 'গোলামারা ইরিগেশন ড্যাম আছে বটে, ৩০-৩৫ বছর আগের। এখন জল আসে না। একবার চাষ। তাও শেষদিকে বর্ষা না হয় তো সেটাও মারা যায়। আমরা বিডিও'র কাছে দাবি করেছিলাম — আপনারা ক্যানেলের ব্যবস্থা করিয়ে দেন, আমরা মেসিন দিয়ে জল তুলে নিব উপরে। কিছু হয় নাই।' নেতুড়িয়া ব্লকের মেকাতলার বাসিন্দা অনিল বাউরি বললেন, 'আমাদের চাষ প্রকৃতির উপর নির্ভর। বর্ষার সময় ছাড়া দ্বিতীয় কোনও চাষের সুযোগ নাই। সরকার যদি আমাদের এলাকার পুকুরগুলার সংস্কার করে দেয় এবং জোড়গুলা বেঁধে দেয়, তবে আমরা জল পাই, এবং আর একটা চাষও করতে পারি।' প্রায় ৩৩ বছরের শাসনেও সিপিএম সরকার এই জরুরি কাজগুলো করেনি।

তাহলে গ্রামে উন্নয়নের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা যে বরাদ্দ হচ্ছে, সেগুলো যাচ্ছে কোথায়? রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ভক্তিপদ ঘোষের বিবৃতিতেই আছে এই প্রশ্নের উত্তর। তিনি বলেছেন, রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। মানুষ পঞ্চায়েতে গিয়ে কোনও পরিষেবা পান না। এমনকী পঞ্চায়েতে উন্নয়ন খাতে যে সব টাকা আসে, তা কোন খাতে খরচ হচ্ছে, জনগণ জানতে পারেন না। ১০০ দিনের কাজ থেকে শুরু করে বিপিএল তালিকায় নাম তোলার এবং বার্ধক্য ভাতার টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হচ্ছে। কয়েকজন মানুষ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করছে। এলাকার উন্নয়ন না করেই কাগজে-কলমে উন্নয়ন দেখানো হচ্ছে। (সূত্র ঃ বর্তমান, ১০-০৯-০৮)। পঞ্চায়েত এলাকায় শাসকদল সিপিএমের নেতা-কর্মীরাই যে সেই 'কয়েকজন মানুষ', সরকারি টাকার হরির লুঠে তারাই যে ফুলে ফেঁপে উঠেছেন, তা স্বয়ং সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বিমান বসুও স্বীকার করেছেন। সেই সব নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছেন, 'এটা কি তাদের বাপ-ঠাকুরদার টাকা?' স্বীকার করেছেন, 'যাদের একটা সাইকেলও ছিল না, তারা বিল্ডিং হাঁকাচ্ছে, চার চাকার গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে' (টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ৩-০৬-০৮)। যেন তিনি সিপিএমের শাসনের তিন দশক বাদে তাঁদের নেতা-কর্মীদের এই ভূমিকাটি সবেমাত্র টের পেলেন। নেতৃত্বের অজ্ঞাতেই যেন সারা রাজ্য জুড়ে সরকারি টাকার এমন হরির লুঠ চলছে! আসলে সবই চলছে তাঁদের মতো নেতৃত্বের প্রশ্রয়ে। চতুর্দিক থেকে সমস্ত পার্টিটার দিকে যখন আঙুল উঠেছে, তখন দুর্নীতি ও কুকীর্তির নোংরা পাঁকে তাঁরা জড়িত নন প্রমাণ করতে নিচুতলার নেতা-কর্মীদের গালাগাল করছেন, রাজ্যবাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। রাজ্যের মানুষকে বিমানবাবুরা কি এতটাই বোকা ভাবেন?

নদীয়ার পলাশি'র আবুবক্কর মণ্ডল দু' বিঘা জমিতে ভাগচাষ করেন। টমেটো, কপি, শশা, বেগুন ফলান। তিনিও এসেছিলেন কৃষক ও খেতমজুরদের মহামিছিলে। বললেন, 'চাষের খরচ খুব বেশি। চাষ করে ফসল বেচতে গিয়ে দাম পাচ্ছি না। বীজ ও তেলের যা দাম, পড়তা হইছে না আমাদের। দামটা একটু কম থাকলে চাষ কইরে আমাদের কিছু হইত, পলাশির কদবানু বিবিও বললেন, 'চাষ কইরে পড়তা হয় না। ডিজেলের দাম বেশি। ৩৫/৩৬ টাকা লিটার! কেরোসিন ৩০ টাকা লিটার! দাম না কমালে ছেলেপুলে নিয়ে বাঁচবো কেমন করে বলুন তো? ৫টি ছেলের দুটো মাধ্যমিক দিয়েছে, মাস্টার রাখতে হয়। পড়াশুনার খরচ তো খুব।'

পলাশির বেলডাঙা কলেজ থেকে বিএ পাশ করে সজল সেখ এখন চাষবাস করেন। বিঘা পাঁচেক জমি। বললেন, 'জমিতে ধান, পেয়ারা চাষ হয়। ১০০-১৫০ টাকা লাঙল, ১২০ টাকা গাড়িভাড়া, স্যালোর জল কিনলে ৭০ টাকা ঘণ্টা, শ্রমিকের মজুরি ৬০-৭০ টাকা। ফলে, চাষ করে লোকসান হচ্ছে। বাঁচার আর পথ কোথায়? সেইজন্য আন্দোলনে এসেছি।' অথচ সিপিএমের নেতা-মন্ত্রীরা বলছেন, রাজ্যের কৃষিকে তাঁরা মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করিয়েছেন; ফলে চাষির উর্বর চাষজমি কেড়ে নিয়ে টাটা-সালেমের হাতে তুলে দিলে চাষির কোনও সমস্যা হবে না।

পঞ্চায়েতি রাজ ও গ্রামোন্নয়নের বড়াই করা সিপিএম সরকারের রাজত্বে কৃষিশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি অন্যান্য রাজ্যগুলির চেয়ে কম। এই ন্যূনতম দৈনিক মজুরি দিল্লিতে ১৪০ টাকা, কেরলে ১২৫ টাকা, উত্তরপ্রদেশে ১০০ টাকা, পাঞ্জাবে ৯৪.৪৮ টাকা, রাজস্থানে ৮১ টাকা, তামিলনাড়ুতে ৮০ টাকা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি খাতা-কলমে ৭৪ টাকা ৩৩ পয়সা। সরকার ঘোষিত এই ন্যূনতম মজুরিও এ রাজ্যের শ্রমিকরা পাচ্ছেন না। বাস্তবে কৃষি, চা বাগান, বিড়ি শ্রমিক সহ অসংগঠিত ক্ষেত্রের কয়েক কোটি শ্রমিক পায় এর অর্ধেক মজুরি।

মুর্শিদাবাদের পলাশির বালি গ্রাম থেকে ৯ মার্চের মহামিছিলে আসা সৈফুদ্দিন সেখ বললেন, 'আমাদের জমি নাই। বর্ষার চাষের সময় পরের জমিতে মজুর খাটি। সারাদিনে পাই ২৫-৩০ টাকা। নুন-ভাতও হয় না। এখন খরা। কোনও কাজ নাই। বেকার। মহাজনের থেকে ঋণ নিই, সংসার চালাই। ১০০ টাকা দিলে মহাজন মাসে ১২ টাকা সুদ নেয়।' এমন করে মহাজনি ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে গিয়েছে গ্রামবাংলার চাষি-মজুররা। কৃষক ও খেতমজুরদের সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে কতটুকু ঋণ পান? তাঁদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋণের জন্য গ্রামীণ মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হয় এবং চড়াসুদ গুনতে হয়। গ্রামোন্নয়নের এই হল করুণ পরিণতি। এর সঙ্গে আছে রাজ্যের সিপিএম সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গবাসীর ঘাড়ে চাপানো ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭১৬ কোটি টাকা ঋণের বোঝা। রাজ্যের সাড়ে আট কোটি মানুষের মাথাপিছু ঋণ দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ৯০৭ টাকা। এই টাকা সুদ সহ আমাদের প্রত্যেককে পরিশোধ করতে হবে।

তাহলে ১০০ দিনের কাজের কী হল? সরকার নিজেদের অপদার্থতা স্বীকার করে বলেছে, ২০০৬-০৭ সালে ১০০ দিনের মধ্যে মানুষকে তারা গড়ে ১৫ দিন কাজ দিতে পেরেছে এবং ২০০৭-০৮ সালে কাজ দিতে পেরেছে মাত্র ১৮ দিনের। ক্যাগ রিপোর্টে ধরা পড়েছে যে, সরকারি এই রিপোর্টও জালিয়াতিতে ভরা। মানুষ কাজ পেয়েছে আরও অনেক কম দিনের। ইসলামপুর থানার টেঁকা রাইপুরের রহমান সেখ তাঁর কষ্টের জীবনের কথা বলতে গিয়ে জানালেন, 'সরকারি আইনে ১০০ দিনের কাজ, না হলে মজুরি দেওয়ার কথা — সেও নাই। কেউ দু-দিন, তিনদিন, কেউ বড়জোর পাঁচদিন কাজ পেয়েছি। আমি জবকার্ড পেয়েছি, কিন্তু কাজ পেয়েছি ২০০৫ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত মোট দিন আটেক হবে। মজুরিও ১৫ দিন, এক মাস দেরি করে পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যের জমিতে মজুরি করি।' এভাবেই তাহলে দিন চলে যায়? প্রশ্ন শুনে হতাশার স্বরে বললেন, 'একে কি আর চলা বলে?'

আরও মর্মান্তিক গ্রামীণ অবস্থা মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার ধরমপুর গ্রাম থেকে আসা রোজিফা বেওয়া, হেনা, রেণুকা, আখলেমা ও খৌজংদের। একজন বললেন, 'জমি-জায়গা কিছু নাই। পরের বাড়ি থাকি। লোকের বাড়ি দুঃখ-ধান্ধা করে খাই।' একজন বললেন, 'খাসের জায়গায় ঘর করে থাকি। লোকের বাড়িতে গোয়াল-গোবর করি। শুধু খাতে দেয়। টাকা দেয় না। ছেলে-মেয়ে স্কুলে পড়াতে পড়াতে বাদ দিয়েছি। ছেলে বড়। সে পরের জমিতে চাষের কাজ করে। ২০-৩০ টাকা পায়।' করুণ মুখে প্রশ্ন করেন, 'বলেন তো, তাতে কি সংসার চলে?' জানালেন, তাঁদের কারও বিপিএল কার্ড হয়নি। পঞ্চায়েত তাঁদের জবকার্ড দেয়নি। ধরমপুর থেকে আসা বঞ্চিত অবহেলিত গরিব মানুষেরা সবাই মিলে একসঙ্গে বলতে লাগলেন, 'আমরা খেতে পাচ্ছি নে, পরতে পাচ্ছি নে। যেদিন খাটালি (কাজ) পাচ্ছি, সেদিন খেতে পাচ্ছি, যেদিন খাটালি পাচ্ছি না, সেদিন ..... '। বর্ধমানের সরপি'র পার্বতী আকুলি'রও 'জমি নাই। দিনমজুরি করে চলে। মজুরি ৫০ টাকা।' বললেন, '১০০ দিনের কাজ গত বছর দু-ধাপে মোট ১১ দিন পেয়েছি। সরপির প্রতিমা বাউরিও বিপিএল কার্ড পাননি। বললেন, '১০০ দিনের কাজ মাসখানেক আগে ৭ দিনের পেয়েছি। বাবুর ঘরে কাজ করি। মাসে ১০০ টাকা দেয়।' জানালেন, তাঁদের তিনজনের সংসারে একজনেরও রেশনকার্ড নেই। রেনু বাউরি বললেন, 'ভ্যান চললে পয়সা হয়, সেদিন খেলুম। না হলে তো এমনি রইলুম। খাটালি (কাজ) খুঁজছি।' দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের চামতা গ্রাম থেকে এসেছিলেন শেফালি দাস। বাড়ির লোক ভ্যান চালায়। ১৫ কাঠা জমি চাষ হয়। প্রশ্ন করলেন, 'খাওয়া-পরা, ছেলেদের লেখাপড়া কেমন করে করাই?' বললেন, 'সরকারি সাহায্য কিচ্ছু পাই না। ১০০ দিনের কাজ ১০ দিন করে বন্ধ আছে। এক মাস বাইর হয়ে গেল, এখনও কাজের টাকা দেয়নি, দিব দিব বলছে।'

বাঁকুড়ার কোতুলপুরের বরাট পাড়ার নির্মল বরাটের ৭/৮ কাঠা ভেস্টেড জমি সম্বল। বর্ষার সময় চাষ হয়। তাহলে সংসার চলে কী করে? বললেন, 'মুনিশ (মজুর) খেটে। একদিন মুনিশ খাটলে মেলে ৫০ টাকা, ১ কেজি চাল ও মুড়ি। কিন্তু বর্ষার চাষের সময় ছাড়া মুনিশ খাটব কোথায়?' বাবলু বরাটের চাষের জমি নেই, জানালেন, 'সাড়ে তিন কাঠা জমিতে ঘর করে আছি। আমাদের সবার একটা করে ঘর। তাতে একটা করে ল্যাম্প জ্বলে। এক একবারে বিল আসে ১৮০ টাকা, ২০০ টাকা, ৩০০ টাকা। মিটারও দেখে না, যা ইচ্ছা বিলে লিখছে। আমাদের দাবি — বিদ্যুতের দাম কমাতে হবে।' বললেন, 'ইন্দিরা আবাসনের ঘর যাদের পাওয়ার কথা তারা পাচ্ছেনি। যাদের জমি আছে তারা পেয়ে যাচ্ছে।' বীরু বরাট সহ পাড়া থেকে আসা অন্যরা চেঁচিয়ে একসঙ্গে বলতে লাগলেন, 'সাড়ে তিন-চার কাঠা ভেস্টেড জমিতে এক একজন ঘর করে আছি। আমাদের বিপিএল কার্ড হচ্ছেনি, মজুরি বাড়ছেনি। আমরা কেরোসিনও পাচ্ছি না; বলে দিচ্ছে — নাই।' একজন বললেন, '২০০৫ সালে পঞ্চায়েত থেকে ১০০ দিনের কাজের একটা বই করে দিয়েছিল, কোনও কাজ হয়নি।'

কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী তো রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেখে সিপিএম সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ, জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের ললিতাবাড়ির জসিমুদ্দিন ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'আমাদের ওখানে রাজগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। সেখানে কেবল সর্দি-কাশি-জ্বরের চিকিৎসা হয়। বাকি সবাইকে যেতে হয় গ্রাম থেকে ৩০-৪০ কিলোমিটার দূরে শিলিগুড়িতে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।' পুরুলিয়ার গোলামারা গ্রামের সেকেন্দার আনসারি ও যজ্ঞেশ্বর মাহাতোর কণ্ঠেও একই কথা; বললেন, 'চয়নপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। ডাক্তার নাই। চিকিৎসা নাই। ১৫ কিলোমিটার দূরে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে আইসতে হয়।'

এই আমাদের গ্রামবাংলা। এখানেই থাকতে হয় আমাদের অন্নদাতা কৃষক ও খেতমজুর বন্ধুদের। তাঁদের এমন দুর্দশার মধ্যে ৩৩ বছর ধরে ফেলে রেখেছে সিপিএম সরকার। সিপিএম সরকারের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি তাহলে কোথায়? সেটা আছে স্রেফ প্রচারে।

মহিষাদলে শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তি স্থাপন

মহিষাদল শহিদ ক্ষুদিরাম আত্মোৎসর্গ শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষ থেকে ১৩ মার্চ রবীন্দ্র পাঠাগারের সামনে শহীদ ক্ষুদিরামের পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের পূর্বে স্থানীয় স্কুল-কলেজের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ সহস্রাধিক মানুষের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মহিষাদল শহর পরিক্রমা করে। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন সারা বাংলা ক্ষুদিরাম আত্মোৎসর্গ শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রায় শতাধিক মানুষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন। বিকালে রবীন্দ্র পাঠাগার মঞ্চে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের যোদ্ধা শ্রদ্ধেয় বিরাজমোহন দাস। বক্তব্য রাখেন ডঃ অমিয় কুমার সামন্ত, কমিটির সভাপতি নিখিল কুমার মাইতি ও কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক হরিপদ মাইতি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যুগ্মসম্পাদক তপন মাইতি।

পূর্ব ইউরোপের শ্রমিকরা আবার আন্দোলনের পথে

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে বেকার সমস্যা মারাত্মক আকার নেওয়ায় লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়া ও বুলগেরিয়ায় হাজার হাজার বিক্ষোভকারী সরকারি ভবনগুলিকে আক্রমণ করেছে এবং ক্ষমতাসীনদের পদত্যাগ দাবি করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় পূর্বের দেশগুলিতে জীবনযাপনের মান আগে থেকেই নিচু ছিল। তবু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবির যতদিন ছিল, ততদিন এসব দেশের শ্রমিকরা কাজের নিরাপত্তা ভোগ করত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা ছিল, সুনিশ্চিত ছিল অবসরকালীন সুযোগসুবিধাগুলি পাওয়া।

বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এইসব দেশে আগামী কয়েক মাসে কর্মহীনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৮০ লক্ষ। পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে কাজ পাওয়ার সুযোগও নেই। ক্যাপিটাল ইকনমিক্স ইন লন্ডনের নেইল শেয়ারিং বলেছেন, বাল্টিক দেশগুলিতে বেকারি ১৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। চাহিদার অভাবে শিল্প কার্যত ধসে পড়েছে। তিনি আরও বলেছেন, এ অঞ্চলের সমগ্র অর্থনীতি মন্দার গ্রাসে চলে যাবে।

দুনিয়াজুড়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে। ১৯৯০ পরবর্তীকালে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থের রক্ষক দক্ষিণপন্থী শাসকরা এসব দেশে ক্ষমতাসীন। তারা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলি অকল্পনীয়ভাবে ছাঁটাই করছে। তার বিরুদ্ধেই শ্রমিক-কর্মচারীরা প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে।

১৬ জানুয়ারি দশ হাজারেরও বেশি মানুষ লাতভিয়ার রিগায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর এক চার্চের সামনে মিলিত হয়ে সরকারি আর্থিক নীতির প্রতিবাদে পার্লামেন্ট অভিযান করে। লাতভিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের গভর্নর বলেছেন, সে দেশের অর্থনীতি ''মরে গেছে।'' পরের দিন লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলিনিয়াসে দেখা যায় একই দৃশ্য। পার্লামেন্টের বাইরে কয়েক হাজার ক্ষুব্ধ মানুষের জমায়েত বিদ্রূপ করে ''চোর চোর'' আওয়াজ থেকে ওঠে। তাদের ক্রোধের লক্ষ্য সে দেশের সরকার, যারা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের 'প্রেসক্রিপশন' মেনে বাজার অর্থনীতি চালু করেছে।

এরই পরিণতিতে দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়েছে। জনকল্যাণমূলক খাতে সরকারি অর্থ বরাদ্দ ব্যাপকভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি, করবৃদ্ধি এবং তার সাথে সাথে বেকারিও বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

বিক্ষোভকারী তরুণেরা সরকারি ভবনগুলিকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়েছে, দোকানের শো-কেস ভেঙেছে, তাদের সাথে ডাক্তার, পুলিশ, চাষি, শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারি ব্যয়সঙ্কোচ ও স্বল্প মজুরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

পরের সপ্তাহে একই ঘটনা ঘটে বুলগেরিয়ায়। ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার সরকারি কর্মচারীদের মিছিল পার্লামেন্টের বাইরে দাঁড়িয়ে নানা আর্থিক দাবি জানাতে থাকে। দাবি করে, দুর্নীতি বন্ধ করার।

এস্তোনিয়া ও হাঙ্গেরিও একই রকম তীব্র জনজাগরণের সামনে দাঁড়িয়ে। হাঙ্গেরিতে শিল্পে উৎপাদন গত ষোল বছরের মধ্যে এত নিচে কখনও নামেনি। বুদাপেস্ট সরকারের খরচ কমানোর ঘোষণার সাথে সাথে ইউরোর তুলনায় দেশীয় মুদ্রার দাম রেকর্ড পরিমাণে কমেছে। ইউক্রেনের অর্থনীতিও অধঃপতনের অতলে নামছে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রধান ডোমিনিক স্ট্রস কান বলেছেন, আগামী দিনে বিক্ষোভ আরও বাড়বে। আগামী কয়েক মাসে অবস্থা আরও ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

''পূর্ব ইউরোপ ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রজাতন্ত্রগুলির অবস্থা হবে সবচেয়ে মর্মান্তিক — অর্থনীতি ও রাজনীতি উভয় দিক থেকেই'' বলেছেন ইকনমিক নিউজ এজেন্সির বিশ্লেষক জোয়ানা গোর্সকা।

কিন্তু কেন এইসব সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো, ইদানীং যাদের বলা হচ্ছিল নবীন ইউরোপ — তারা এই অর্থনৈতিক ধস ও তীব্র জনবিক্ষোভের মুখে এসে দাঁড়াল?

পূর্ব ইউরোপের প্রতিটি দেশ সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যা মানতে বাধ্য হল, তা এক কথায় 'শক্ থেরাপি' — যার উদগাতা হার্ভার্ড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অর্থনীতির অধ্যাপক জেফ্রি সাশ। সে নীতির মূল বৈশিষ্ট্য হল, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পগুলিকে যথেচ্ছ ও পাইকারি হারে ব্যক্তিমালিকের হাতে তুলে দেওয়া, মাইনে কমানো, কর্মী সংখ্যা কমিয়ে বেকারি বাড়ানো ও পণ্যমূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক ব্যয় কমানো এবং পেনশন ছাঁটাই। পূর্ব ইউরোপকে বাঁচাতে নতুন প্রযুক্তি, নতুন গঠন প্রক্রিয়া এবং নতুন পরিচালন পদ্ধতি কী হবে, তা এবার বলবে শিল্পপতিরা, অর্থনীতিবিদেরা নয়, বলেছেন সাশ।

পূর্ব ইউরোপে সরকারি শিল্পক্ষেত্র ভেঙে যাওয়ার পর পশ্চিমী একচেটিয়া পুঁজি এই সুশিক্ষিত অথচ বাঁচার তাগিদে মরিয়া শ্রমশক্তিকে সস্তায় পেয়ে যায়। ১৯৮৯ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে ৭০ হাজার সংস্থাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বাজারের এই আচমকা তেজিভাবের পিছনে ছিল সহজলভ্য ও অল্প সুদে ঋণ, ভুয়ো পুঁজি বিনিয়োগ, লাগামহীন ফাটকাবাজি ও অলীক সম্পত্তি বেচাকেনা। দুনিয়াজোড়া ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ধসের সাথেই তা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল, বিশ্বায়িত বাজারের তেজ গেল শুকিয়ে।

জীবনযন্ত্রণা আজ এত গভীর ও নির্মম যে, ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল 'দ্য ল্যানসেট' পর্যন্ত পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ১৯৯০ পরবর্তী কয়েক বছরে ১০ লক্ষ মৃত্যুকে ঐ 'শক' খাওয়ার উপদেশ মেনে নেওয়ার ফল হিসাবে দেখছে। তারা বলছে, এই মৃত্যুমিছিলের কারণ হল, মূল্যের বিনিয়ন্ত্রণ, বেসরকারীকরণ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পেনশনে সরকারি বরাদ্দ ছাঁটাই।

ঐ রিপোর্ট জানাচ্ছে যে, পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি নয়া পুঁজিবাদী দেশে গড় আয়ু পাঁচ থেকে সাত বছর পর্যন্ত কমেছে এবং ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত পাঁচ বছরে সমাজতন্ত্র ছেড়ে পুঁজিবাদকে মেনে নিয়েছে এমন দেশগুলিতে ৩০ লক্ষ শিশুমৃত্যু এবং কমপক্ষে ১ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের অকালমৃত্যু ঘটেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন আই এল ও জানাচ্ছে যে, 'শক থেরাপি'র পরিণতিতে ইতিমধ্যেই রাশিয়া, কাজাখস্তান, লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং এস্তোনিয়ায় ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে কর্মক্ষম পুরুষের মৃত্যুর হার ৪২ শতাংশ বেড়ে গেছে এবং তার সাথে বেকারি বেড়েছে ৩০৫ শতাংশ।

চেক প্রজাতন্ত্র, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও রোমানিয়ায় এ বছরের জানুয়ারির পর থেকে মুদ্রামূল্য ৩.৮ শতাংশ থেকে ১১.৬ শতাংশ পর্যন্ত নেমে গেছে এবং আরও নেমে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে।

এই অবস্থায় বেকারি ও মৃত্যুকে ঠেকানোর একটাই বিকল্প রাস্তা ঃ শ্রমিক আন্দোলনকে আবার জাগানো। রয়াল ব্যাঙ্ক অফ কানাডার অন্যতম কর্তা লাইজেল রেন্ডেল তাঁর শাসকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বলেছেন — বর্তমান শাসকগোষ্ঠী হঠাৎ ভেঙে পড়তে পারে এবং বামপন্থী আন্দোলনের বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এ সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার।

পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই দলের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সাজেম আলি ১৩ মার্চ ভোর ৩-৩০ মিনিটে কলকাতা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৭ বছর। তাঁর মরদেহে দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড মানিক মুখার্জীর পক্ষ থেকে মাল্যদান করেন কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অজয় চক্রবর্তী। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানান ডাঃ পি কে হাজরা। এরপর প্রয়াত কমরেড সাজেম আলির মরদেহ তাঁর কর্মক্ষেত্র মুর্শিদাবাদের লালবাগ শহরে নিয়ে গিয়ে দলের কার্যালয়ে শায়িত রাখা হয়। সেখানে শহরের বুদ্ধিজীবী, অ্যাডভোকেট, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক-খেতমজুর সহ বহু সাধারণ মানুষ এবং জনবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি সহ সর্বস্তরের অগণিত মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দলের গণসংগঠনগুলির পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়। প্রয়াত কমরেডের মরদেহ বহরমপুরের জেলা কার্যালয়ে আনা হলে সেখানে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক অদিতি ধাওয়া, বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির নেতা শিবু স্যানাল, পার্টির জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ, অফিস ও প্রেসের প্রতিনিধিবৃন্দ, দলের জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল প্রমুখ। পরে শত শত মানুষ মিছিল সহকারে শেষযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

৭০ দশকের প্রারম্ভে লালবাগের প্রসাদপুর অঞ্চলের মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান কমরেড সাজেম আলি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ছাত্রাবস্থায় এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং কলেজে ডিএসও সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়াসে নিজেকে নিযুক্ত করেন। 'দলই জীবন' এই সংস্কৃতি অর্জনের সংগ্রামে তিনি ব্রতী হন এবং পিতৃগৃহ, কেরিয়ার ত্যাগ করে, ডিগ্রিকে তুচ্ছ করে নিজেকে একজন বিপ্লবী কমিউনিস্ট হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে কষ্টকর সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই সংগ্রাম করে গেছেন। কমরেড সাজেম আলির স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যাও দলের কর্মী। কমরেড সাজেম আলি জেলার বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ছিলেন, এবং ২০০০ সালে বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় থানার লকআপে নির্মম পুলিশি অত্যাচারের শিকার হন। তিনি কৃষক ও খেতমজুরদের দুঃখ-কষ্টের আজীবন শরিক ছিলেন এবং কৃষক-খেতমজুর সংগঠনের জেলার দায়িত্ব দরদ ও নিষ্ঠাভরে পালন করে গেছেন। দুঃখ, দারিদ্র, কষ্টের মধ্যে বিপ্লবী জীবন ও আদর্শ কীভাবে হাসিমুখে রক্ষা করতে হয় কমরেড সাজেম আলি তাঁর আমৃত্যু সংগ্রামী জীবনের মধ্য দিয়ে তা দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখে গেছেন।

কমরেড সাজেম আলি লাল সেলাম

শিক্ষকদের বিধানসভা অভিযান

২০ মার্চ বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কয়েক শত শিক্ষক-শিক্ষিকা মিছিল সহকারে বিধানসভা অভিযানে সামিল হন এবং মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি পেশ করেন।

সমাবেশে সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষাকে ধ্বংস করছে, শিক্ষক জীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। তিনি পিটিটিআই সমস্যার জন্য রাজ্য সরকারকে সম্পূর্ণ দায়ী করে অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয় হস্তক্ষেপ দাবি করেন। পে-কমিশনের ২৭ মাসের বকেয়া বেতন ভাতা, ৩৯ মাসের বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসাভাতা না দেওয়া সহ নানা অসঙ্গতি তুলে ধরে অবিলম্বে তা নিরসনের দাবি জানান।

মিছিল মেট্রো চ্যানেলে উপস্থিত হলে পুলিশ গতিরোধ করে। সেখানেই শিক্ষকরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। কার্ত্তিক সাহার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি পেশ করে।

আন্দোলনের অন্যান্য দাবিগুলি হল, পার্শ্বশিক্ষকদের স্থায়ীকরণ, ৫৫ হাজার শূন্যপদে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ, জানুয়ারি-ডিসেম্বর শিক্ষাবর্ষ দ্রুত চালু, প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত এক জন শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, শিক্ষাদান ব্যতিরেকে অন্য কাজে শিক্ষকদের না লাগানো, পুষ্টিকর মিড ডে মিল সরবরাহ, প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা ও বৃত্তি পরীক্ষা চালু ইত্যাদি।

অন্যান্যদের মধ্যে মোসাব্বর হোসেন, তপতী মিত্র, অজিত হোড়, স্বপন গরাই, সতীশ সাউ, কনক সর্দার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

তৃতীয় ফ্রন্ট — দরকষাকষির সুবিধাবাদী মঞ্চ

পাঁচের পাতার পর

নীতিগতভাবেও কংগ্রেস-বিজেপির সঙ্গে মোর্চাভুক্ত এই দলগুলির বিশেষ ফারাক আছে কি? সিপিএম এ রাজ্যে যে নীতি নিয়ে চলছে, তা তো বাস্তবে কেন্দ্রের কংগ্রেস-বিজেপিরই নীতি। বিশ্বায়নের নীতি মেনে বেসরকারীকরণ, ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি, করবৃদ্ধি, এস ই জেড, খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ প্রভৃতি কোনও ক্ষেত্রেই সিপিএমের নীতি কংগ্রেস-বিজেপির নীতি থেকে আলাদা কিছু নয়। এমনকী পরমাণু চুক্তির দোহাই দিয়ে যে সিপিএম ভোটের আগে আগে ইউ পি এ ছাড়ল, তারাই এ রাজ্যে সুন্দরবনে পরমাণু কেন্দ্র গড়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। এলাকার মানুষের প্রবল বিরোধিতায় তারা শেষপর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হয়, যদিও পূর্ব মেদিনীপুরের হরিপুরে পরমাণু কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা তারা এখনও ত্যাগ করেনি। আবার মুখে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার হাজার বক্তৃতা দিলেও মেদিনীপুরের কলাইকুণ্ডায় ভারত-মার্কিন যৌথ সামরিক মহড়ার আয়োজনে সমস্ত সহযোগিতাই তারা করেছে। অবশ্য লোকদেখানো একটা বিক্ষোভও তারা দেখিয়েছিল— যা দেখে দেশের মানুষ নাম দিয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার 'কলাইকুণ্ডা স্টাইল'। অপরদিকে চুরি-দুর্নীতিতেও আজ সিপিএম কোনও বুর্জোয়া দলের থেকে আলাদা নয়। মোর্চার অন্য দলগুলিও যে যেখানে ক্ষমতায় থেকেছে, প্রত্যেকেই সাধারণ মানুষ, শ্রমিক-চাষির উপর ব্যাপক লুঠপাট চালিয়েছে; জাতের নামে হোক, ধর্মের নামে হোক, আর গরিব মানুষের স্বার্থরক্ষার নামেই হোক, সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে পুঁজিপতিদেরই সেবা করেছে। আজও যে কোনও উপায়ে ক্ষমতার অন্দরে প্রবেশ করে এই লুঠপাট চালানোই তাদের উদ্দেশ্য। না হলে নীতিগতভাবে কংগ্রেস-বিজেপির জনবিরোধী নীতির সঙ্গে এই দলগুলির কারওরই ফারাক নেই, যেমন নেই এ রাজ্যে সিপিএমের। সেই অর্থে দলগুলিকে সমমনোভাবাপন্ন বলা যেতেই পারে। ফলে কংগ্রেস-বিজেপির একই নীতি নিয়ে চলা দলগুলির এই জোট, কংগ্রেস জোট, বিজেপি জোটের পাল্টা দরকষাকষির নতুন জোট হতে পারে, কিন্তু কোনওভাবেই কংগ্রেস-বিজেপির নীতির বিকল্প হতে পারে কি?

দেশের অর্থনীতিতে আজ প্রবল মন্দা। ছাঁটাই এবং মূল্যবৃদ্ধির চাপে দেশের মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। দেশজুড়ে শ্রমিক-চাষি-সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ। কেন্দ্র এবং রাজ্যে সরকারগুলির জনবিরোধী চরিত্র ক্রমাগত প্রকট হয়ে উঠছে। সর্বত্রই সরকারগুলি জনসমর্থন হারিয়ে আতঙ্কে রয়েছে। সিপিএম-ও এ রাজ্যে আসন হারানোর আতঙ্কে ভুগছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রে কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং নির্বাচনের পর দরকষাকষির ক্ষেত্রে যাতে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা যায়, তাই হরেকরকম দলগুলিকে নিয়ে সিপিএম নেতাদের জোট বাঁধার এই মরিয়া প্রচেষ্টা। এই দলগুলির উদ্দেশ্য, এখনই সরাসরি কংগ্রেস বা বিজেপি জোটে শামিল না হয়ে অপেক্ষা করা এবং দেখা, ভোটের পরে পরিস্থিতি কী দাঁড়ায় এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া। ভোটের পর যদি কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, তবে সিপিএম নেতারা যে কংগ্রেসের সাথেই সরকার গড়বেন, তা তাঁরা আগাম ঘোষণা করে রেখেছেন; তা না হলে, কংগ্রেসকে সরকার গড়তে ভেতর বা বাইরে থেকে সাহায্য করে গত লোকসভার মতো দরকষাকষি করে বৈধ-অবৈধ উপায়ে নানা সুযোগ-সুবিধা আদায় করবেন। আবার এন ডি এ ছেড়ে আসা দলগুলি যে এন ডি এ-তে ফিরে যাবে না, এমন কোনও প্রতিশ্রুতিও না সিপিএম, না মোর্চার অন্য দলগুলি — কেউই দেয়নি। বিজেপি একটু সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেই দেখা যাবে, এই সমস্ত ঝাঁকের কই আবার ঝাঁকেই ফিরে যাবে।

ফলে এ কথা বুঝতে কারও অসুবিধা নেই যে, তৃতীয় মোর্চা নামধারী দলগুলির এই জোট বাঁধার মধ্যে কোনও নীতি নেই, কোনও আদর্শ নেই। এমনকী কীসের ভিত্তিতে এই জোট তার কোনও স্পষ্ট ধারণাও তাদের নিজেদের মধ্যে নেই। স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস ও বিজেপির নীতির বিরুদ্ধে বিকল্প নীতির কোনও ঘোষণা বা কর্মসূচিও তাদের নেই। অর্থাৎ পুরোপুরি দিশাহীন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ভাগ্যান্বেষী কতগুলি দলের এক জগাখিচুড়ি এই তথাকথিত তৃতীয় বিকল্প। বাস্তবে এই দলগুলির জোট গঠনের পিছনে যেমন কোনও নীতি-আদর্শ নেই, তেমনই জনস্বার্থের ছিটেফোঁটাও নেই। সত্যিই তারা অকংগ্রেস-অ-বিজেপি বিকল্প গঠন করতে চাইলে এই উভয় দলের চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে জনস্বার্থবাহী সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করত এবং কংগ্রেস-বিজেপির নীতিগুলির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণআন্দোলনের ডাক দিত। বাস্তবে তা তাদের উদ্দেশ্যই নয়। উদ্দেশ্য হল, যে কোনও প্রকারে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কিছু আসন সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়ে দরকষাকষি করে ক্ষমতায় অংশ নেওয়া। রাজনীতির নামে এই চূড়ান্ত নীতিহীনতাই দেশের চূড়ান্ত সর্বনাশ করছে।

পি টি টি আই সমস্যা সমাধানের দাবিতে এবং একের পর এক ছাত্রের আত্মহননের ঘটনার প্রতিবাদে ১৮ মার্চ কয়েকশ' পিটিটিআই ছাত্রের বিধানসভা অভিযান কর্মসূচিতে পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। ২ জন ছাত্রী সহ বহু ছাত্র গুরুতর আহত হয়। শতাধিক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। নৃশংস পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে ডব্লিউ বি পি টি টি এস ইউ ১৯ মার্চ এসপ্ল্যানেড মেট্রো চ্যানেলে অবস্থানের ডাক দেয়। ঐদিন এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র ছাত্র-যুবরা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল করে ধর্মতলায় এসে পি টি টি আই ছাত্রদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে।

গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে আসন্ন লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন

লোকসভা

রাজ্য	কেন্দ্রের নাম		প্রার্থীর নাম
অন্ধ্রপ্রদেশ	১। সেকেন্দ্রাবাদ	—	কমরেড সিএইচ মুরাহরি
আসাম	২। ধুবরি	—	কমরেড মিনহার আলি মণ্ডল
	৩। মঙ্গলদৈ	—	কমরেড ভূপেন্দ্র নাথ কাকতি
	৪। শিলচর	—	কমরেড কান্তিময় দেব
	৫। বরপেটা	—	কমরেড জয়নাল আবেদিন
	৬। করিমগঞ্জ (এস সি)	—	কমরেড প্রভাস সরকার
বিহার	৭। বৈশালী	—	কমরেড ইন্দ্রদেব রায়
	৮। মুঙ্গের	—	কমরেড প্রমোদ কুমার
দিল্লি	৯। উত্তর-পূর্ব দিল্লি	—	কমরেড ম্যানেজার চৌরাসিয়া
গুজরাট	১০। বরোদা	—	কমরেড তপন দাশগুপ্ত
হরিয়ানা	১১। রোহ্‌টক	—	কমরেড অনুপ সিং
ঝাড়খণ্ড	১২। জামসেদপুর	—	কমরেড সীতারাম টুডু
কর্ণাটক	১৩। বাঙ্গালোর দক্ষিণ	—	কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী
	১৪। বাঙ্গালোর সেন্ট্রাল	—	কমরেড কে উমা
	১৫। বেলারি	—	কমরেড এ রামনজনাপ্পা
	১৬। গুলবর্গা	—	কমরেড এইচ ভি দিবাকর
	১৭। রাইচুর	—	কমরেড কে সোমশেখর
কেরালা	১৮। ত্রিবান্দ্রাম	—	কমরেড এম শাজারখান
	১৯। কুইলন	—	কমরেড এস রাধাকৃষ্ণন
	২০। পথানামথিটা	—	কমরেড ভি পি কোচুমোন
	২১। মাভেলিক্কারা (এস টি)	—	কমরেড কে এস শশীকলা
	২২। আল্লেপ্পি	—	কমরেড এস সিথিলাল
	২৩। কোট্টায়ম	—	কমরেড মিনি কে ফিলিপ
	২৪। চালাক্কুড়ি	—	কমরেড ড. পি এস বাবু
	২৫। কোঝিকোড	—	কমরেড ডি সুরেন্দ্রনাথ
তামিলনাড়ু	২৬। উত্তর চেন্নাই	—	কমরেড ভি শিবকুমার
	২৭। থেনি	—	কমরেড পি পাণ্ডিয়ান
	২৮। কুড্ডালোর	—	কমরেড চন্দ্র
উত্তরপ্রদেশ	২৯। জৌনপুর সদর	—	কমরেড জগদীশ চন্দ্র আস্থানা
	৩০। ঘোসি	—	কমরেড শৈলেন্দ্র কুমার
পশ্চিমবঙ্গ	৩১। জয়নগর (এস সি)	—	কমরেড ডাঃ তরুণ মণ্ডল
	৩২। ঝাড়গ্রাম (এস টি)	—	কমরেড সুশীল মাণ্ডি
	৩৩। বোলপুর (এস সি)	—	কমরেড অধ্যাপক বিজয় দলুই
	৩৪। বর্ধমান-দুর্গাপুর	—	কমরেড শ্যামলী মুখার্জি
	৩৫। বাঁকুড়া	—	কমরেড লক্ষ্মী সরকার
	৩৬। পুরুলিয়া	—	কমরেড বিসম্বর মুড়া
	৩৭। মুর্শিদাবাদ	—	কমরেড খাদিজা বানু
	৩৮। মালদা (উত্তর)	—	কমরেড মল্লিকা সরকার (নন্দী)
	৩৯। রায়গঞ্জ	—	কমরেড অধ্যাপক মানস জানা
	৪০। জলপাইগুড়ি	—	কমরেড হরিভক্ত সর্দার

অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশার বিধানসভা নির্বাচন '০৯

	বিধানসভার নাম		প্রার্থী
অন্ধ্রপ্রদেশ	১। খৈরাতাবাদ	—	কমরেড এস গোবিন্দরাজুলু
	২। অনন্তপুর (আরবান)	—	কমরেড জি ললিতা
ওড়িশা	১। যোশীপুর (এস টি)	—	কমরেড শম্ভুনাথ নায়েক
	২। বিঞ্ঝারপুর (এস সি)	—	কমরেড সুরেন্দ্র মল্লিক
	৩। তালচের	—	কমরেড মানসী সাঁই

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in